বঙ্গ-বীরাঙ্গনা

রায়বাঘিনী

শ্রীবিধুভুষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

প্রকাশক—

শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া।

১৩২৪ মূল্য ১।০ টাকা।

হাওড়া।
৪নং তেলকলঘাট রোড, কর্ম্মযোগ প্রেস হইতে
শ্রীযুগলকৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

"বঙ্গ-বীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী" সম্বন্ধে এসিয়াটীক-সোসাইটীর সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, সি, আই, ই, মহোদয়ের

মন্তব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "রায়বাঘিনী" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। ইহাতে মোগল-পাঠানের যুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ভূরসুটের ব্রাহ্মণ-রাজবংশের ইতিহাস লেখা হইয়াছে। ভূরসুট ও নিকটবর্ত্তী পরগণাসমূহে গ্রামে গ্রামে গিয়া এই ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। তাহাতে বিধুবাবু বেশ পরিশ্রম করিয়াছেন ও বেশ ইতিহাস-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। এই রাজবংশ প্রায় চারিশত বৎসর অপ্রতিহতপ্রভাবে দক্ষিণ-রাঢ়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং অনেক কীর্ত্তিকলাপও রাখিয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বংশ ধ্বংস হইয়া যায় ও এই বংশের একজন বাঙ্গালার প্রধান কবি হইয়া উঠেন। ইনিই আমাদের রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। আকবরের সময় এই বংশের একজন রাণী, রাণী ভবশঙ্করী, উড়িষ্যার পাঠানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাঢ়দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া বাদসাহ আকবর তাঁহাকে "রায়বাঘিনী" উপাধি দিয়াছিলেন। এখনও বাঙ্গালাদেশে পরাক্রমশালিনী রমণী হইলেই তাহাকে "রায়বাঘিনী" বলিয়া থাকে।

বিধুবাবুর এই উদ্যম অতিশয় প্রশংসনীয় কিন্তু তাঁহার উদ্যম যেন এইখানেই শেষ না হয়। ভূরসুট অতি প্রাচীন স্থান। ৯৯১ খৃষ্টাব্দে এইখানে বসিয়া কায়স্থ পাণ্ডুদাসের জন্য শ্রীধর বৈশেষিক দর্শনের প্রধান ভাষ্য পদার্থ-ধর্ম্ম-সংগ্রহের টীকা লিখিয়া লোকগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। [illegible] সালে কৃষ্ণমিশ্র এই প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক লেখেন,

তাহাতেও ভুরস্থটের ব্রাহ্মণগণের বিদ্যাবুদ্ধি ও জাত্যভিমানের অনেক কথার উল্লেখ আছে। ভুরস্থট এককালে বাঙ্গালার নবদ্বীপ ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যখন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে ৫৬ গ্রামীণ বা গাঞী হয়, তখন ভুরস্থটের নামেও একটী গাঞী হইয়াছিল। ভুরস্থটের ব্রাহ্মণদিগকে ভূরিশ্রেষ্ঠিক অথবা ভূরিগাঞী বলিত। এই ভূরিগাঞী ব্রাহ্মণেরা এখনও ভুরস্থট পরগণায় আছেন কি না জানিবার জন্য সকল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরই কৌতূহল আছে। বিধুবাবু যদি এ সকলেরও তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া দিতে পারেন, যথার্থ ইতিহাসের উপকার করা হয়।

বইখানি ইতিহাস হইলেও একেবারেই নীরস নহে। পড়িলে নবেলের মত লাগে। আমিও একদমেই গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। মাঝখানে ছাড়িয়া দিতে কষ্ট হইয়াছিল। ভাষা অতি সুন্দর এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাগ্রামের, নানা দেব-মন্দিরের, নানা যুদ্ধের কথা থাকায় পড়িতে অতিশয় মনোহর হইয়াছে। বিধুবাবু যে সকল প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহাতে কালাপাহাড়কেও এই বংশের লোক বলিয়া মনে হয়। কালাপাহাড় বাঙ্গালায়, উড়িষ্যায় অনেক মন্দিরই ভাঙ্গিয়াছেন কিন্তু ভুরস্থটের একটীও ভাঙ্গেন নাই। ইহাতে তাঁহার কথা অনেকটা সত্য বলিয়াই বোধ হয়। বইখানি ভালই হইয়াছে। এখন বাঙ্গালার লোকে, বিশেষ বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা পড়িলে অনেক উপকার হইবে। ইতিহাসের মাল-মসলা সব গ্রামেই আছে কিন্তু সব গ্রামে বিধুবাবু নাই, এই-ই দুঃখ।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

উৎসর্গপত্র।

দীনজন-প্রতিপালক, ধর্ম্মপ্রাণ, দানশৌণ্ড, বিদ্যোৎসাহী
মহামহিমান্বিত রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল
খাঁ রাজচূড়ামণি মহোদয় করকমলেষু।

রাজন্,

প্রাচীন ভুরিশ্রেষ্ঠ-রাজ্যের কিয়দংশ এক্ষণে আপনার অধিকারভুক্ত। এই প্রাচীন রাজ্য এক ব্রাহ্মণ রাজবংশ দ্বারা ন্যূনাধিক পাঁচশত বৎসর কাল শাসিত হইয়াছিল। এই রাজবংশোপম রাজা রুদ্রনারায়ণ রায়ের সহধর্ম্মিনী রণস্থলে যে অদ্ভুত বীরত্ব ও সমরকৌশল প্রদর্শন করেন, তাহাই এই পুস্তকের বর্ণিত বিষয়। দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গের অধিকাংশ এক্ষণে আপনার শাসনাধীন। রাজলক্ষ্মী এখন আপনার অঙ্কশায়িনী। অতএব রাজন্! এই পুস্তকের বর্ণিত বীর-রাণী আপনার নিকটেই যথোপযুক্ত সম্মানিতা হইবেন আশা করিয়া এই "বঙ্গ-বীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী" আপনার করকমলেই অর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার।

নিবেদন।

আমি বাল্যকালে আমার পূজনীয় পিতা পণ্ডিতাগ্রগণ্য কেদারনাথ তর্কালঙ্কারের মুখে ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ্যের ব্রাহ্মণ-রাজবংশের কীর্ত্তিকথা অতিশয় আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতাম। তখন মনে হইত, বড় হইলে, ব্রাহ্মণ-রাজগণের রাজধানী, ছাউনাপুরের ভূমধ্যস্থ দুর্গ, বীরাঙ্গনা রায়বাঘিনীর পড়া, যে স্থলে বীরা রাণী অদ্ভুত বীরত্ব ও সমরকৌশল প্রদর্শন করিয়া মুসলমানগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন ও অন্যান্য রাজকীর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিব। এই উদ্দেশ্যে বহু চেষ্টা করিয়া ও স্বয়ং বহু স্থানে গমন করিয়া ব্রাহ্মণ-নরপতিগণের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। গড়ভবানীপুরের যে স্থানে রাজবাটী ছিল, সেই স্থানের, ছাউনাপুর গড়ের, রায়বাঘিনীর পড়ার ও অনেকগুলি দেবমন্দিরের ফটো লইয়াছি। গড়ভবানীপুরের মণিনাথ মন্দিরে রাজা দেবনারায়ণ রায়ের নাম ও ১৩০৬ শকাব্দা এখনও খোদিত রহিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল, ব্রাহ্মণ-নরপতিগণের প্রদত্ত ভূসম্পত্তির কতকগুলি দলিল আমার হস্তগত হয়। পণ্ডিত শিরোমণি, প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একখানি দলিলের মোহরাঙ্কিত অংশ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের সাহায্যে পড়াইয়া লন; তাহাতে জানা গিয়াছে যে, মোহরে রাজা নরনারায়ণের নাম লিখিত আছে। রাজা নরনারায়ণ ভুরস্থটের একজন বিখ্যাত রাজা। ভুরস্থটে এমন ব্রাহ্মণ অতি অল্পই আছেন, যাঁহারা নরনারায়ণদত্ত ভূসম্পত্তির অধিকারী নহেন।

ভুরস্থটের ব্রাহ্মণ-রাজবংশীয় বাঁকিপুর হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট তাঁহাদের বংশীয় নরপতিগণের নাম প্রাপ্ত হইয়াছি।

এই পুস্তকের বর্ণিত ঘটনার একটীও কল্পনাপ্রসূত নহে। নরপতি-গণের কীর্ত্তিকলাপ, শিলালিপি ও দলিলাদি হইতেই অধিকাংশ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। জনশ্রুতির উপরও যে নির্ভর করি নাই, তাহা নহে। কালাপাহাড়ের বিষয় যাহা কিছু লিখিয়াছি, তৎসমস্তই প্রবাদবাক্য অবলম্বন করিয়া। ভুরস্থটের অন্তর্গত মুসলমানপ্রধান পাহাড়পুর গ্রাম কালাপাহাড়ের স্থাপিত বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। ব্রাহ্মণ-রাজবংশীয় রাজীবলোচন রায় সুন্দরী মুসলমানকন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করেন—এই কথা ভুরস্থটের প্রাচীন লোকগণের মুখে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। কালাপাহাড় ভারতের যে যে স্থানে গমন করিয়া-ছিলেন, সেই সেই স্থানের সমস্ত দেবমন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি যখন উড়িষ্যাবিজয়-মানসে গৌড় হইতে যাত্রা করেন, তখন তাঁহাকে অবশ্যই ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য অতিক্রম করিতে হইয়াছিল কিন্তু অনেক প্রাচীন দেবমন্দির, শিলালিপি মস্তকে ধারণ করিয়া এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই রাজ্যে কালাপাহাড়ের কোন অত্যাচারচিহ্ন লক্ষিত হয় না। দেশ-প্রচলিত জনশ্রুতি ও এই ব্যাপার দর্শনে বিশ্বাস হয় যে, পেঁড়োরগড়ের ব্রাহ্মণ-রাজবংশীয় রাজীবলোচনই কালাপাহাড়। কবিকুলকেশরী ভারতচন্দ্রও এই পেঁড়োরগড়েই প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি রাজা নরেন্দ্র-নাথের পুত্র ছিলেন। পাঠক-পাঠিকাগণের বিশেষ অবগতির জন্য ভুরিশ্রেষ্ঠ-রাজ্যের ব্রাহ্মণ-নৃপতিগণের বংশলতা প্রদত্ত হইল।

পূজ্যপাদ পরমধার্ম্মিক শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

গ্রন্থকার।

রাণী ভবশঙ্করা (রায়বাঘিনী)।

তিনি বামহস্তে চর্ম্ম ও দক্ষিণহস্তে দেবদত্ত অসি ধারণ করিয়া, দৈত্যদর্প নিসূদনী, করালিনী রুদ্রাণীরূপে মন্দিরদ্বারে দণ্ডায়মানা হইলেন।

বঙ্গ-বীরাঙ্গনা।

ভূরিশ্রেষ্ঠ পুরে (ভুরসুটে)

ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা।

ভাগীরথীর দশ ক্রোশ পশ্চিমে, হিন্দুগণের পবিত্র তীর্থ তারকেশ্বরের প্রায় চারি ক্রোশ দক্ষিণে এবং দামোদর নদের দেড় ক্রোশ পূর্ব্বদিকে দিলাকাশ নামক একখানি গ্রাম অবস্থিত। রোণ নামক দামোদরের এক শাখা দিলাকাশের পশ্চিম প্রান্ত ধৌত করিয়া প্রবাহিত। প্রাচীন-

কালে দিলাকাশ একটী ধন-জন পূর্ণ সমৃদ্ধ স্থান ছিল। এক্ষণে এই গ্রাম ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দুইচারি ঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও কতকগুলি দুলে-বাগ্দীর দ্বারা অধ্যুষিত। কেবল-মাত্র ভৈরবীদেবীর মূর্ত্তি ইহার প্রাচীন স্মৃতি এখনও জাগাইয়া রাখিয়াছে। ভারতে মুসলমান আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতে এই গ্রামে ক্ষত্রিয়েতর হিন্দুগণ রাজত্ব করিত।

অধুনা দিলাকাশের পূর্ব্বদিকে খুঁড়ীগাছী নামক এক-খানি গ্রাম আছে। পূর্ব্বে এই গ্রামে বহুসংখ্যক ভীমদর্শন চণ্ডাল বাস করিত। চণ্ডালগণ দিলাকাশের পূর্ব্বোক্ত রাজগণের সৈন্য শ্রেণীভুক্ত থাকিয়া নরহত্যা, লুণ্ঠন ও অন্যান্য পাশবিক অত্যাচারপূর্ণ কার্য্যে তাহাদিগকে সাহায্য করিত। এখনও অনেক চণ্ডাল এই গ্রামে বাস করিতেছে এবং তাহাদের স্থাপিত ভীষণাকৃতি এক কালীমূর্ত্তি এই স্থানে বিরাজিতা আছেন। এই কালী "ডাকাতে কালী" নামে বিখ্যাত।

প্রাচীনকালে দামোদর ও রোণের মধ্যস্থ তাবৎ ভূভাগ গহন অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। এই বনমধ্যে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, বন্যবরাহ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী এবং হরিণ, বন্যমহিষ, বন্যছাগ প্রভৃতি তৃণভোজী পশুগণ অবাধে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। বহুসংখ্যক কাপালিক এই অরণ্য মধ্যে বাস করিত। অনার্য্য রাজগণ ইঁহাদের পরম ভক্ত ছিল।

কথিত আছে—একজন কাপালিক দিলাকাশে এই ভৈরবী-দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বে প্রতি অমাবস্যায় এই ভৈরবীদেবীর সম্মুখে এক একটী নরবলি প্রদত্ত হইত।

শনিভাঙ্গড় নামক একজন বাগ্‌দী এই অনার্য্য রাজ-বংশের শেষ রাজা। একদা ইহার অনুচরগণ ভাগীরথী তীর হইতে এক ব্রাহ্মণ বালককে অপহরণ করিয়া আনে। শনিভাঙ্গড় দেবীর সম্মুখে এই বালককে বলি দিবার জন্য কাপালিকের হস্তে অর্পণ করে। ব্রাহ্মণ-শিশু বলিরূপে প্রদত্ত হইবার বয়স প্রাপ্ত হয় নাই দেখিয়া কাপালিক আপনার নিকট তাহাকে কয়েক বৎসর রক্ষা করেন। ক্রমে বালকের উপর মমতার সঞ্চার হইলে কাপালিক তাহাকে বধ না করিয়া সামান্যরূপ শিক্ষা দান করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে বালক যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলে অশ্বারোহণে ও অসি-বর্শা-চালনায় সুদক্ষ হইয়া উঠে।

তৎপরে কাপালিক এই ব্রাহ্মণ যুবককে শনিভাঙ্গড়ের মন্ত্রী ও সেনাপতিরূপে নিযুক্ত করিয়া দেন। এই ব্রাহ্মণ যুবক চতুরানন নিয়োগী নামে পরিচিত। ইহার বংশ-পরিচয় সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

স্বীয় শক্তিবলে চতুরানন রাজ্যমধ্যে সর্ব্বপ্রধান লোক হইয়া উঠেন। প্রজাগণ সকলেই তাঁহাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা

করিত ও তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য ছিল। এই সকল বাধ্য প্রজার সাহায্যে চতুরানন দুর্বৃত্ত বাগ্‌দী রাজাকে কৌশলে নিহত করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং দামোদর তীরবর্ত্তী ভবানীপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।

রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করীর স্বামী রাজা

রুদ্রনারায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ

নরপতিগণের

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

চতুরাননের পুত্রসন্তান ছিল না। তারা নাম্নী তাঁহার একটী সুন্দরী কন্যা ছিল। চতুরানন ফুলিয়া নিবাসী সদানন্দ মুখোপাধ্যায় নামক সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ যুবকের হস্তে স্বীয় কন্যা সমর্পণ করেন। কালক্রমে তারাদেবীর দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ শ্রীমন্ত।

চতুরাননের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সদানন্দ রাজ্যলাভ

করেন। সদানন্দ অতিশয় বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ ও অশেষ গুণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি রাজবলহাট নামক একটী নগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজবল্লভীদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা সদানন্দ রাজ্যমধ্যে কৃষি ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তৎকালে কার্পাস বস্ত্রবয়ন শিল্পের জন্য ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করে। এখনও আটঘরা, কল্যে, রাজবলহাট, পেড়েলা, বিড়ালা, লোহাগাছী, রাণীবাজার, আঁটপুর, কৃষ্ণনগর, মোড়া প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র উৎপন্ন হয়। হাওড়ার হাটে প্রতি মঙ্গলবার যে সমস্ত দেশীয় বস্ত্র বিক্রীত হয় তাহার অধিকাংশই এই সকল গ্রামজাত। এই সকল গ্রাম বস্ত্র বয়নের শব্দে দিবারাত্র মুখরিত। রাজবলহাটে গমন করিলে মনে হয় যেন ইংলণ্ডের মান্‌চেষ্টার নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই রাজবলহাট গ্রামে তিন চারি হাজার তন্তুবায়ের বাস। রাজা সদানন্দ বস্ত্র-বয়ন শিল্পের উন্নতি করিয়া বঙ্গদেশের যে মঙ্গল-সাধন করিয়া গিয়াছেন, অনেক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিও তাহা করিতে পারেন নাই।

বস্ত্র-বয়ন শিল্প ভিন্ন অন্যান্য শিল্পও তাঁহার সময়ে উন্নতি লাভ করে। থলের সূত্রধর এবং পাঁতিহাল ও কল্যাণচকের কুম্ভকার এখনও দেশপ্রসিদ্ধ।

চতুরাননের কন্যা এবং সদানন্দের পত্নী তারাদেবী রাণীবাজার গ্রাম স্থাপন করিয়া ঐ স্থানে সিদ্ধেশ্বরীদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মন্দিরের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে দুইটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করান। এখনও রাণীবাজারে সিদ্ধেশ্বরী মূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং দুইটী দীঘি অগাধ নির্ম্মল জলরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া রাণীর দীঘি নামে বিখ্যাত আছে।

সদানন্দ পরলোক গমন করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসনারোহণ করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন। তিনি খানাকুল-কৃষ্ণনগর এবং জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর নামক দুইটী নগর স্থাপন করিয়া,খানাকুল-কৃষ্ণনগরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে ঐ স্থানে মনোবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, স্মৃতি, চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা হইত। বহুকাল পর্য্যন্ত খানাকুল-কৃষ্ণনগর বঙ্গদেশে বিদ্যাচর্চ্চার একটী কেন্দ্রস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও হিন্দু সমাজে খানাকুল কৃষ্ণনগরের মতে অনেক শাস্ত্রীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই খানাকুল-কৃষ্ণনগরেই বঙ্গের সুকৃতী সন্তান মহাত্মা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-চিকিৎসক সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, স্বদেশ-হিতৈষী পণ্ডিতপ্রবর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এবং হাইকোর্টের

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব, পরার্থপর, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বিপিন-বিহারী ঘোষ প্রভৃতি মহাত্মগণ এই খানাকুল-কৃষ্ণনগরেই জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দেবনারায়ণ রাজত্ব লাভ করেন। দেবনারায়ণ অত্যন্ত ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। মণিনাথ গোস্বামী নামক এক সন্ন্যাসীর অদ্ভুত তপঃপ্রভাব দেখিয়া তিনি তাঁহার প্রতি এত ভক্তিমান্ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার বাসস্থানের উপর এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে শিব স্থাপন করেন। মণিনাথ গোস্বামীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি এই শিবকে মণিনাথ শিব আখ্যা প্রদান করেন। এই মন্দির গড়ভবানীপুরে এখনও বর্ত্তমান। এখনও মন্দিরের উপরিভাগে রাজা দেবনারায়ণের নাম, ১৩০৬ শকাব্দা, ২১শে শ্রাবণ সুস্পষ্ট-রূপে অঙ্কিত রহিয়াছে।

দেবনারায়ণ ইহলীলা সংবরণ করিলে তাঁহার পুত্র দর্পনারায়ণ রাজা হইলেন। ইনি অতি উগ্র প্রকৃতির রাজা ছিলেন। গৌড়াধিপ গণেশের পুত্র চৈৎমল্ এক মুসলমান ওমরাহের সুন্দরী কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করেন এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু-গণকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ

করেন। দর্পনারায়ণ চৈৎমলের এই অন্যায় কার্য্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু বঙ্গের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মতিলাল ইহাঁদের বিবাদ মিটাইয়া দেন। তৎপরে চৈৎমলও হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতে বিরত হয়েন। দর্পনারায়ণের পর ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে যথাক্রমে উদয়নারায়ণ, সত্যনারায়ণ ও শিবনারায়ণ রাজত্ব করেন। ইঁহাদের রাজত্বকালে বঙ্গে মুসলমান শক্তি অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই সময়ে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা উদয়নারায়ণ প্রভৃতির নামানুসারে এই রাজ্যমধ্যে উদয়নারায়ণপুর, শিবপুর প্রভৃতি গ্রাম স্থাপিত হয়। এখনও ঐ সমস্ত গ্রাম পূর্ব্ব নামে পরিচিত থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই নরপতি-গণের রাজত্বকালে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয় নাই, এবং এই সকল নৃপতি সম্বন্ধীয় লোক-পরম্পরাগত কোনও কাহিণী শ্রুতিগোচর হয় নাই।

শিবনারায়ণের পর তাঁহার পুত্র রুদ্রনারায়ণ রাজ্যলাভ করেন। রাজা রুদ্রনারায়ণের ভার্য্যা রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী ও রাজা রুদ্রনারায়ণের শাসনকালের সমস্ত ঘটনা এবং রাণী ভবশঙ্করীর বীরত্বকাহিণী বর্ণনা করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই জন্য রুদ্রনারায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী নর-পতিগণের বিবরণ অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। কবিবর

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বিশুদ্ধ টীকা, সমালোচনা, বিদ্যা-সুন্দরের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও তাঁহার বংশপরিচয়ের সহিত শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। সেই গ্রন্থে ভুরস্থুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণিত হইবে।
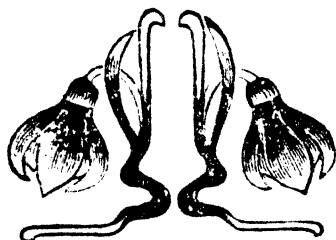
রাজা রুদ্রনারায়ণ

ও

রাজীবলোচন (কালাপাহাড়)।

রাজা রুদ্রনারায়ণের শাসনকালে উড়িষ্যায় মহাপরাক্রান্ত নরপতি মুকুন্দদেব অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন। মুকুন্দদেব বঙ্গে মুসলমান রাজ্য উচ্ছেদ-মানসে আয়োজন করিতেছিলেন; ইহা জানিতে পারিয়া রুদ্রনারায়ণও তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। মুকুন্দদেবও অত্যন্ত বলদৃপ্ত হইয়া বঙ্গে মুসলমানাধিকার আক্রমণ করিলেন। পেঁড়ুয়াগড়ের রাজা অমরেন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র রাজীবলোচন এই সম্মিলিত সেনার সেনাপতিত্বপদে অভিষিক্ত হইলেন।

কিংবদন্তী আছে, এই রাজীবলোচন রায় পরে কালা-পাহাড় নামে হিন্দুসমাজে মহা আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন। রাজীবলোচন বাল্যকাল হইতেই অমিত সাহসী ও অদ্বিতীয় বলবান্ ছিলেন। দিবসের অধিকাংশ সময়ই তিনি অশ্বারোহণে, অসি-চালনায় ও ব্যায়ামে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার তালপ্রাংশু দেহ, বিশাল বক্ষঃ আজানুলম্বিত, সুবলিত ভুজযুগ, জ্যোতিষ্মান্ চক্ষুর্দ্বয়, বলিষ্ঠ সুদীর্ঘ পদযুগল এবং ক্ষীণ কটিতট নয়নগোচর করিলে শত্রুগণের হৃদয় সভয়ে কম্পান্বিত হইত। কথিত আছে, একদা একটী হস্তী শৃঙ্খল্ মুক্ত হইয়া দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিলে, মহাবলশালী ভীমাবতার রাজীবলোচন হস্তিশুণ্ড দুই হস্তে ধারণ করিয়া এরূপ শক্তির সহিত আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, মহাকায় বারণ সেই আকর্ষণ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল।

রাজীবলোচন (কালাপাহাড়)

মুসল্‌মানগণের সহিত মহাযুদ্ধ ।

এই মহাশক্তিধর রাজীবলোচনের বাহুবলে ও সমর-কৌশলে মুকুন্দদেব হুগ্‌লীর নিকটবর্ত্তী ত্রিবেণী নামক স্থানে মুসল্‌মানগণকে পরাস্ত করিয়া তথায় হিন্দুবিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুকুন্দদেব ত্রিবেণীতে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং গঙ্গাতীরে একটী ঘাট নির্ম্মাণ করেন। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-রাজ্যের পুনরভ্যুত্থান দেখিয়া বঙ্গবাসিগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু এ সুখ হতভাগ্য বঙ্গবাসীর দগ্ধাদৃষ্টে অধিক কাল স্থায়ী হইল না। ভগবান্ কি অপরাধে ভারতকে এরূপে পদে পদে লাঞ্ছিত করিতেছেন, তাহা তিনিই বুঝিতে পারেন। ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা, কেমন করিয়া বিশ্বরাজরাজেশ্বরের বিশ্বরাজ্য-নীতি হৃদয়ঙ্গম করিব ?

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে সুলেমান কররাণি নামক একজন মুসল্‌মান নরপতি গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। উত্তরবঙ্গের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, হিন্দুগণের উত্তরোত্তর যেরূপ বলবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে বঙ্গদেশে মুসলমান রাজ্য অচিরে ধ্বংস হইবে। কিন্তু বঙ্গাধিপ সুলেমান কেবলমাত্র নিজ সৈন্যবলের উপর নির্ভর করিয়া মহা-পরাক্রান্ত রুদ্রনারায়ণ ও মুকুন্দদেবের সম্মিলিত, অসংখ্য বীর্য্যবান্, সাহসী ও রণকুশল সৈন্যগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা সমীচীন বিবেচনা করিলেন না। সুতরাং তিনি বাদ্‌সাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বাদ্‌সাহ হিন্দু-রাজগণের শক্তি ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে সুলেমানের সাহায্যার্থে অগণিত সৈন্য প্রেরণ করিরেন। অতঃপর সুলেমান ভীমপরাক্রমে সম্মিলিত হিন্দুসৈন্য আক্রমণ করিল। উভয়পক্ষে ঘোরতর সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। বিজয়লক্ষ্মী কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাহা স্থির করা একপ্রকার অসাধ্য হইয়া পড়িল।

অবশেষে মুসলমান সৈন্যগণের ভীমবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া হিন্দুসৈন্যগণ পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিলে, কুমার সদৃশ বীর্য্যশালী মহাবীর রাজীবলোচন বেগবান্ তুরঙ্গমোপরি আরোহণ করিয়া নিষ্কোষিত অসি হস্তে শত্রু-ব্যূহ ভেদ করতঃ অগণিত মুসলমান সৈন্য ধ্বংস করিতে

আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভীষণ হুঙ্কারে ও রণোন্মত্ততায় মুসলমান সৈন্যগণ ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল। সেনাপতি অদম্য উৎসাহে ও নির্ভীকতার সহিত শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিতেছে দেখিয়া হিন্দুসৈন্যগণের নির্ব্বাপিতপ্রায় বীর্য্যবহ্নি পুনর্ব্বার দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা মহাবিক্রমে মুসলমান সৈন্য পুনরাক্রমণ করিল। এইবার মুসলমানগণ প্রমাদ গণিল। বহুসংখ্যক হতাহত হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যে রণস্থল পূর্ণ হইল। রাজীবলোচনের অদ্ভুত যুদ্ধকৌশলে মুসলমানসৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। বিজয়লক্ষ্মী রাজীবলোচনের অঙ্কশায়িনী হইলেন। হিন্দু-সৈন্যগণ বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া, পলায়নপর মুসলমান-সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে বহু বিপক্ষ বীর বধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র অরাতি-রুধিরে প্লাবিত করিল।

মুসলমান পরাজয়।

মুকুন্দদেবের সহিত যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সুলেমান অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, এবং কিরূপে বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তদ্বিষয়ে নানা-প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সুলেমান স্থির বুঝিয়াছিলেন যে, রাজীবলোচন সম্মিলিত হিন্দু-সৈন্যের সেনাপতি থাকিতে, তাঁহার বিজয়লাভের আশা দুরাশা

মাত্র। কিন্তু কি উপায়ে সুলেমান তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। কারণ, রাজীবলোচন উড়িষ্যারাজ মুকুন্দ-দেবের বেতনভুক্ সেনাপতি নহেন। তিনি রাজা রুদ্র-নারায়ণ রায়ের বংশোদ্ভব এবং যুদ্ধকার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায়। রাজা রুদ্রনারায়ণও মুসলমান রাজ্য ধ্বংস করিবার উদ্দেশে মুকুন্দদেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ।

অতএব রাজনীতিকুশল সুলেমান পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। সন্ধির পর সুলেমান রুদ্র-নারায়ণের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া বহুমূল্য রত্নাদি উপহার প্রেরণ করিলেন। রাজা রুদ্রনারায়ণও বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ একশত হস্তী ও মূল্যবান্ দ্রব্যাদিসহ রাজীব-লোচনকে গৌড়নগরে পাঠাইয়া দিলেন।

রাজীবলোচনের গৌড়ে অবস্থান।

বঙ্গাধিপ সুলেমান সাদর-সম্ভাষণ করিয়া মহাবীর রাজীবলোচনকে গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী এক সুরম্য হর্ম্ম্যে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সুলেমান্ রাজীবলোচনের সেবা-শুশ্রূষার জন্য বহু দাস-দাসী এবং মনোরঞ্জনের জন্য সুন্দরী নর্ত্তকীবৃন্দ

নিযুক্ত করিয়া দিলেন। নবাব রাজীবলোচনের অত্যন্ত সমাদর ও সম্মান করিতে লাগিলেন এবং কমলনেত্রা, নৃত্য-গীত-পরায়ণা, নবযৌবন সম্পন্না, সুন্দরী রমণীগণকে তাঁহার সহচরী করিয়া দিলেন। যুবক রাজীবলোচন এই সমস্ত আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়া পরম সুখে গৌড়ে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসামান্য বল-বিক্রমের কথা গৌড়নগরে অচিরাৎ প্রচার হইয়া পড়িল। তিনি যখন অশ্বারোহণ করিয়া রাজপথে বহির্গত হইতেন, তখন তাঁহার সেই বীরত্বব্যঞ্জক সৌষ্ঠবসম্পন্ন সুন্দর কলেবর দর্শন করিবার জন্য আবাল-বৃদ্ধ রাজপথে দণ্ডায়মান হইত এবং কুলমহিলাগণ গবাক্ষ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার সেই নারী-জন-মন-মোহকর অপূর্ব্ব রূপ নিরীক্ষণ করিত।

রাজীবলোচন ব্যাঘ্র পিঞ্জরাবদ্ধ করিতেছেন।

একদিন রাজীবলোচন যোদ্ধবেশে রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, এক ভয়ানক নর-শোণিত-লোলুপ শার্দ্দুল পিঞ্জর ভঙ্গ করিয়া নবাবের পশু-শালা হইতে বহির্গত হইয়া, রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ব্যাঘ্রভয়ে নগরবাসিগণ চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। ব্যাঘ্রকে পুনঃ পিঞ্জরাবদ্ধ

করিবার জন্য সহর-কোতোয়াল সশস্ত্র অনুচরগণসহ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যাঘ্র এই সমস্ত কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া পথিমধ্যে বসিয়া লাঙ্গুল আছড়াইতেছে এবং ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছে। কেহই ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইতেছে না।

এইরূপ ভাবে কিছু সময় অতীত হইলে, ব্যাঘ্র কোতোয়ালকে লক্ষ্য করিয়া লম্ফ প্রদান করিল। উপস্থিত জনমণ্ডলী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া হায় হায় করিতে লাগিল। প্রাসাদোপরি রমণিগণ "ভগবন্ রক্ষা কর" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, লোকসকল প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

রাজীবলোচন দেখিলেন,—এই সময়ে ব্যাঘ্রকে নিরস্ত করিতে না পারিলে, নিশ্চয়ই সে কোতোয়ালের প্রাণবিনাশ করিবে। অতএব বীরকেশরী রাজীবলোচন আর সময়ক্ষেপ না করিয়া, এক লম্ফে ব্যাঘ্রের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং বজ্রহস্তে ব্যাঘ্রের দুই হস্ত পশ্চাৎদিক্ হইতে ধারণ করিয়া সবলে মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিলেন, ব্যাঘ্র বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার হস্ত ছাড়াইতে পারিল না। ব্যাঘ্র-রক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ পিঞ্জর আনিয়া উপস্থিত করিল। রাজীবলোচন ব্যাঘ্রকে কুক্কুর-শাবকের ন্যায় অনায়াসে উত্তোলন করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া দিলেন। এই অলৌকিক বীরত্ব দর্শনে সকলেই

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং জয়ধ্বনিতে দিগন্ত পূর্ণ করিল। প্রাসাদ বাতায়ন হইতে দিব্যাঙ্গনাগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই রাজীব-লোচনের এই অসামান্য বল-বীর্য্য ও সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

রাজীবলোচনের বীরত্ব ও সৌন্দর্য্য দর্শনে নবাবকন্যার মোহ।

নবাবপুত্রীও কুমারসদৃশ বীর্য্যবান্ ও মনোমুগ্ধকর-বপু রাজীবলোচনের অলৌকিক সাহস ও বিক্রম গবাক্ষদ্বার দিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল। পরমশোভাস্পদ পূর্ণচন্দ্র গগন-মণ্ডলে উদিত হইলে চকোর যেমন সুধাকরের সুধাপান বাসনায় অনন্যমনা হইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, তদ্রূপ নবাবকুমারী রাজীবলোচনের পূর্ণেন্দুনিভ বদনের দিকে নির্ণিমেষলোচনে চাহিয়াছিল।

ব্যাঘ্র পিঞ্জরাবদ্ধ হইবার পর, রাজীবলোচন সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন, সমস্ত লোকজনও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল, কিন্তু নবাবপুত্রী অচল অটল ভাবে সেই গবাক্ষ-দ্বারে রাজপথের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নবাবপুত্রী নিস্পন্দ, নিশ্চল—চক্ষের পলকটী পর্য্যন্তও যেন পড়িতেছে না, নিশ্বাস-প্রশ্বাসও যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

যোগীর ন্যায় পরমাত্মধ্যানে মগ্ন হইয়া যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে। মনঃপ্রাণ এক হইয়া যেন কোন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের অনুসরণ করিয়াছে।

নবাবপুত্রী এই অবস্থায় বহুক্ষণ গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মানা। তাহার এক সহচরী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, তাঁহার হস্তধারণ করিলে, নবাবদুহিতার চমক ভাঙ্গিল। তিনি থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বাঘ ধরা পড়িয়াছে ?" সহচরী হাসিতে হাসিতে বলিল—"আপনি কি ভাবিতেছেন ? অনেকক্ষণ বাঘ ধরা পড়িয়াছে।" নবাবপুত্রী বলিলেন—"তা হবে, আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। চল, এখান হইতে এখন চলিয়া যাই।"

এই বলিয়া নবাবকন্যা স্বীয় কক্ষে গমন করিয়া শয়ন করিলেন। কোন্ অজানিত শক্তিবলে তাহার মনঃপ্রাণ অপহৃত হইয়াছে—নবাবপুত্রী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তবে এইটুকুমাত্র বুঝিলেন যে, তাহার প্রাণ-মন রাজীবলোচনের অপার প্রেম-সাগরের অতলতলে তলাইয়া গিয়াছে, আর পুনঃ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। নবাবপুত্রী শূন্যমনে শূন্যপ্রাণে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রফুল্ল আনন বিষাদ-কালিমাচ্ছন্ন হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মাতা, কন্যার এই প্রেমের বিষয় অবগত হইয়া, নবাবকে সমস্ত কথা বলিলেন।

কন্যার প্রেমবার্ত্তা নবাবের কর্ণগোচর হইল।

নবাব পূর্ব্ব হইতেই ভাবিতেছিলেন—কি উপায়ে বীর রাজীবলোচনকে স্বীয় পক্ষভুক্ত করিবেন। মহিষীর নিকট কন্যার প্রেমের কথা জ্ঞাত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"যুবকগণকে সুন্দরী রমণীর রূপফাঁদে ফেলিয়া বশীভূত করা অপেক্ষা অন্য সহজ পন্থা আর নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পরমরূপ-লাবণ্যবতী কন্যার অসামান্য-রূপমাধুরী দর্শনে রাজীবলোচন নিশ্চয়ই বিমুগ্ধ হইয়া পড়িবে। তখন আর তাহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে না। কিন্তু আমি মুসলমান, রাজীবলোচন হিন্দু-ব্রাহ্মণ। এ বিবাহে তিনি সম্মত হইবেন কেন?

রাজীবলোচনের নিকট দূতী প্রেরণ।

নবাব এই কার্য্য সাধনের জন্য একজন দূতী নিযুক্ত করিলেন। দূতী একদিন রাজীবলোচনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"নবাবের বাড়ী হইতে কিছু গোপনীয় সংবাদ লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, অনুমতি করিলে প্রকাশ করিতে সাহসী হই।" দূতীর কথায় রাজীব-

লোচন বলিলেন—"কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছ, নির্ভয়ে প্রকাশ করিতে পার।" দূতী উত্তর করিল—"আপনি যে দিন কোতোয়ালকে ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, এবং অবলীলাক্রমে ব্যাঘ্রটীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করেন, সেইদিন নবাবকন্যা আপনাকে দর্শন করিয়াছিল। দর্শনাবধি আপনার রূপমোহে সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। দিবারাত্র আপনার চিন্তায় সে মগ্ন হইয়া আছে। দিন দিন মলিন ও কৃশ হইয়া পড়িতেছে। যে মুখ সর্ব্বদা হাস্যে উৎফুল্ল থাকিত, তাহা এক্ষণে বিষাদকালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যে রমণী বিলাসের সুখময় ক্রোড়ে চিরকাল লালিত পালিত, সে আজ একেবারেই বিলাস-বিভ্রম পরিত্যাগ করিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এইরূপ ভাবে কিছুদিন থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার প্রাণান্ত ঘটিবে। সেইজন্য নবাব আমাকে আপনার নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়াছেন, যে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রকৃত উদারতার পরিচয় দিন।" দূতীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজীবলোচন বলিলেন—"আমি ব্রাহ্মণকুমার হইয়া কিরূপে নবাবকন্যার পাণিগ্রহণ করিব? যাহা হউক, তুমি নবাবকে আমার সেলাম জানাইয়া বলিও, আমি তাঁহার সহিত শীঘ্র একদিন সাক্ষাৎ করিব।"

নবাব ও নবাব-কন্যার সহিত রাজীব-লোচনের সাক্ষাৎকার।

দূতী চলিয়া গেলে, রাজীবলোচন ভাবিতে লাগিলেন, কি মহাবিপদেই পড়িলাম, ব্রাহ্মণ হইয়া কিরূপে মুসল্‌মান্ কন্যা বিবাহ করি? আর সত্যসত্যই কি নবাব-কন্যা আমার জন্য মলিন ও শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে? আমি তাহাকে বিবাহ না করিলে সত্যসত্যই কি তাহার প্রাণান্ত ঘটিবে? কি করিবেন, কিছুই তিনি স্থির করিতে না পারিয়া, একদিন নবাব সন্নিধানে উপনীত হইলেন। নবাব সাদর-সম্ভাষণ করিয়া রাজীবলোচনকে নিকটে বসাইলেন, এবং নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—"যদি আপনি আমার কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে জীবনধারণ করিতে পারিবে না।" নবাবের এই কথা শুনিয়া রাজীবলোচন উত্তর করিলেন—"আমি ব্রাহ্মণ-পুত্র হইয়া কিরূপে আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারি?"

নবাব।—আমি আপনাকে জেদ করিতেছি না। আপনি বীর, বুঝিয়া দেখুন—আপনার জন্য যদি একটী প্রাণিহত্যা হয়, তাহার জন্য দায়ী কে?"

এই কথা শুনিয়া রাজীবলোচন কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং নবাবকে বলিলেন—"আপনার কন্যার অবস্থা আমি স্বচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করি; যদি তাহার প্রাণ নষ্ট হই-বার চিহ্ন দর্শন করি, তাহা হইলে আমি তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলাম।"

রাজীবলোচন ও নবাব কন্যা।

নবাব রাজীবলোচনের কথায় সম্মত হইয়া কন্যাকে ডাকিয়া দিতে বলিয়া সে গৃহ ত্যাগ করিলেন। তৎপরে নবাব-পুত্রী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া যেমন তাহার প্রাণের আরাধ্য-দেবতা রাজীবলোচনের মনোমুগ্ধকররূপরাশি দর্শন করিলেন অমনি হৃদয়ের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া রাজীবলোচনের পদতলে পতিত হইলেন।

নবাব-পুত্রীর এই ভাব দর্শন করিয়া রাজীবলোচনের প্রাণ একেবারে দ্রবীভূত হইল। রাজীবলোচন সেই অপ্সরা-সদৃশী অনিন্দ্যসুন্দরীর কমনীয়ভুজবল্লী ধারণ করিয়া স্বীয় ক্রোড়ে তাহার মোহন মূর্ত্তি স্থাপিত করিলেন, এবং নিজ উত্তরীয়-বসনের দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন।

প্রেম-মুগ্ধা নিরুপমলাবণ্যবতী যুবতীর নবনীতকোমল অঙ্গস্পর্শে রাজীবলোচনের দেহ-মধ্যে এক বৈদ্যুতিক

শক্তির ক্রীড়া হইতে লাগিল। বক্ষঃস্থল দুরুদুরু কম্পিত হইতে লাগিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল। তাঁহারও যেন চৈতন্যলোপ হইবার উপক্রম হইল। রাজীবলোচনের প্রাণ তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে নবাব-দুহিতার প্রাণে যাইয়া মিলিল। নবাব-কন্যার শূন্য প্রাণ যেন পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ধীরি ধীরি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যখন দেখিলেন যে তিনি তাঁহার হৃদয়ারাধ্য জীবিত-সর্ব্বস্বের মোহন অঙ্কে শায়িত আছেন, তখন কি যেন এক অনির্ব্বচনীয়, কল্পনাতীত মধুর আনন্দভরে তাঁহার নয়ন-পল্লব আপনাআপনি মুদ্রিত হইল। তাঁহার বদনে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ঝলসিতে লাগিল।

রাজীবলোচন আত্মহারা হইয়া সুন্দরীর মুখপদ্মে স্বীয় বদন সন্নিবিষ্ট করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপ কিয়ৎকাল গত হইলে রাজীবলোচন নবাব-দুহিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য সত্যই কি তুমি আমার বিহনে বাঁচিতে পার না? যদি তাহাই হয় তবে কি তুমি আমার সহিত যেখানে সেখানে যাইতে সম্মত আছ?"

নবাবদুহিতা ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আমার জীবনের জীবন আপনি। আপনার বিহনে কিরূপে আমার জীবন থাকিবে? আপনার সঙ্গে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া শাকান্ন ভোজনেও আমি স্বর্গ-সুখে সুখী হইতে পারিব।

যাহা আজ্ঞা করিবেন অবনত-মস্তকে শিরোধার্য্য করিব। দয়া করিয়া অধিনীকে শ্রীচরণে স্থান দিন; ত্যাগ করিবেন না।"

নবাব-পুত্রীর কথা শুনিয়া রাজীবলোচন বলিলেন, "জাতি, কুল, মান, অহঙ্কার, অভিমান সমস্তই তোমার অতলস্পর্শপ্রেম-পারাবারে ডুবিয়া গিয়াছে। প্রাণেশ্বরি! তোমার অকপট প্রণয়ের জন্য সামান্য পৃথিবী কেন, স্বর্গ-রাজ্য পর্য্যন্তও তুচ্ছ করিতে পারি—যদি তোমার সন্তোষ-বিধানার্থ প্রজ্জলিত অনল-মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় তাহাতেও কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত নহি। তুমি আর চিন্তা করিয়া নিজ শরীর নষ্ট করিও না।" এই কথা বলিয়া রাজীবলোচন কক্ষ হইতে বহিক্রান্ত হইলেন এবং নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সুলেমান ও রাজীবলোচন।

নবাব অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া রাজীবলোচনকে ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজীবলোচন তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন "আমি আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিতে পারি বটে, কিন্তু ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারি না।"

নবাব উত্তর করিলেন "মুসলমান-কন্যা বিবাহ করিয়া আপনি কি হিন্দু-সমাজে আশ্রয় পাইবেন? আর আমিই বা মুসলমান হইয়া কিরূপে ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী এক জন লোকের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিব?"

রাজীবলোচন বলিলেন, "আপনি যদি মুসলমান হইয়া স্বীয় কন্যা ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীকে অর্পণ করিতে না পারেন, তবে এতদূর অগ্রসর হওয়া আপনার ভাল হয় নাই। আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য স্বীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিব কি না, প্রথমেই তাহা জানা উচিত ছিল। এক্ষণে আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম। এবং শীঘ্রই গৌড় ত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিব।"

রাজীবলোচন ও মুকুন্দদেব।

গৌড় আক্রমণের পরামর্শ।

তৎপরে রাজীবলোচন নবাবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ত্রিবেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বাহুবলে নবাব-দুহিতাকে লাভ করিবার জন্য গৌড় আক্রমণ করিতে মুকুন্দদেবকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মুকুন্দদেব বলিলেন, "আমি গৌড় আক্রমণ করিতে পারি এবং

তোমার বাহুবলে ও অদ্ভুদ্ রণ-কৌশলে মুসলমান রাজ্যও ধ্বংস করিতে পারি বটে কিন্তু তোমার এখন প্রধান উদ্দেশ্য নবাব-দুহিতা লাভ। নবাব-কন্যাকে বিবাহ করিলে তুমি হিন্দু-সমাজে স্থান পাইবে না। বিশেষতঃ তুমি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি হিন্দু থাকিয়া কিছুতেই মুসলমান্-কন্যা বিবাহ করিতে পার না। ইহাতে হিন্দু-সমাজে মহা ব্যভিচার উপস্থিত হইবে।

মুকুন্দদেবের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজীব-লোচন অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "যে নারী আমার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে, যে প্রেমময়ী রমণী আমা-বিহনে জীবনধারণে অসমর্থ, তাঁহাকে পরিত্যাগ করা কি অধর্ম্ম নহে?" তাঁহাকে হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তৎপরে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলে দোষ কি?

মুকুন্দদেব গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "তুমি বালক, তোমার হিতাহিত জ্ঞান এখনও সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় নাই; তাই তুমি এরূপ ভাবে আমার সহিত কথা কহিতেছ। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোক কিছুতেই হিন্দু হইতে পারে না।

ইহা শুনিয়া রাজীবলোচন অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "জগন্নাথদেবের পুরী-মধ্যে জাতি-বিচার নাই কেন?"

মুকুন্দদেব। জাতি-বিচার আছে বৈ কি। কেবল ভগবানের প্রসাদ-গ্রহণে কোন বিচার নাই। কিন্তু পুরি-মধ্যে ম্লেচ্ছ কিম্বা যবন প্রবেশ করিতে পাবে না।

রাজীব। যদি উড়িষ্যা মুসলমান করতলগত হয়, তখন পুরিমধ্যে মুসলমানদের প্রবেশ করিতে কে নিষেধ করিবে?

মুকুন্দদেব। সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী জগন্নাথদেবই তাহার প্রতিবিধান করিবেন।

রাজীব। জগন্নাথ কেন বলিতেছেন? উড়িষ্যানাথ বলুন।

মুকুন্দদেব। যুবক, চপলতা পরিত্যাগ কর।

রাজীব। চপলতা কিসে হইল, মহাশয়, আমি যুক্তি-সঙ্গত কথাই বলিতেছি। তিনিই জগন্নাথ, যিনি জগতের সমস্ত জীবের আশ্রয়। কিন্তু আপনার জগন্নাথ একটী অবলা নারীকে আশ্রয় দান করিতে পারেন না।

মুকুন্দদেব। উদ্ধত যুবক! অহঙ্কারে একান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছ। পবিত্র ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। অহঙ্কারোন্মত্ত যুবক, যাও, আমার সম্মুখে আর জগন্নাথ-দেবের নিন্দা করিও না। যথা ইচ্ছা আচরণ কর। তুমি কি, মনে করিয়াছ যে তোমার ভয়ে আমি ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে অনুমোদন করিব?

রাজীব। যে ধর্ম্ম এত সঙ্কীর্ণ, যে ধর্ম্ম পতিতকে দূরে

থাকৃ, অতি উন্নত-হৃদয়া, প্রেমরূপিণী রমণীকেও স্বীয় অঙ্কে স্থান দান করিতে অসমর্থ, সে ধর্ম্ম, ধর্ম্মই নহে।

মুকুন্দদেব। যে পাষণ্ড যবনার প্রেমে পড়িয়া, কাম-মোহে অন্ধ হইয়া স্বীয় ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, যে নরাধম আর্য্য-ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জগন্নাথ দেবের নিন্দা করিতে পারে, সেই ব্রাহ্মণ-কুলকলঙ্ক, স্বার্থপর, কামুকের মুখদর্শন করিতে ইচ্ছা করি না।

রাজীবলোচন মুকুন্দদেবকে তিরস্কার করিয়া গৌড় অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

মুকুন্দদেবের এই তিরস্কার-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজীবলোচন এক লম্ফে অশ্বারোহণ করিলেন এবং অসি নিষ্কোষিত করিয়া মুকুন্দদেবের প্রতি রোষকষায়িত-লোচনে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "যে জগন্নাথদেবের নিন্দা আজ অসহ্য হইল, সেই জগন্নাথকে তোমার সম্মুখে, এই তরবারির আঘাতে, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দগ্ধ করিব। দেখিব কোন্ ধর্ম্মবলে তুমি তাহা বারণ করিতে সমর্থ হও।

এই বলিয়া রাজীবলোচন অশ্বে কশাঘাত করিলেন অশ্ব তীরবেগে গৌড় অভিমুখে ধাবিত হইল। মহা অভি-

মানী অহঙ্কারোন্মত্ত রাজীবলোচন ঘোর অভিমানভরে প্রিয় জন্মভূমিকে মুসলমান-পদানত করিতে যত্নবান্ হইল। যে বীরকেশরী রাজীবলোচন বঙ্গ হইতে যবনদিগকে চিরকালের জন্য বিদায় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, সেই অপরিণত-বুদ্ধি যুবক যবনীর প্রেমাকর্ষণে এবং রাজ-নীতি-জ্ঞান-শূন্য অদূরদর্শী মুকুন্দদেবের নির্ব্বোধ-জনোচিতপরুষব্যবহারে মহা অভিমান ও অহঙ্কারে উন্মত্ত ও দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞান-শূন্য হইয়া, হিন্দু-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ যবনীর পাণিগ্রহণ করিল। হিন্দুর আশা-প্রদীপ চিরকালের জন্য নিব্বাপিত হইল। যে ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়া হিন্দুগণ অভিষ্ট-পথে অগ্রসর হইতেছিল, বিধির মহারহস্য-পূর্ণ বিধানে বঙ্গের ভাগ্য-গগণে সহসা কালমেঘ উদিত হইয়া সেই ধ্রুবতারাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বঙ্গের আশা-ভরসা চিরতরে লুপ্ত হইল।

সুলেমান রাজীবলোচনকে কন্যাদান করিয়া সেনাপতিত্বে নিয়োগ করিলেন।

এক্ষণে বঙ্গাধিপ সুলেমান্ মহানন্দে রাজীবলোচনকে

প্রধান সেনাপতিপদে বরণ করিলেন। গৌড়নগরে মহা-মহোৎসব চলিতে লাগিল। প্রতি সৌধচূড়ায় মনোজ্ঞ কেতনরাজি সদর্পে উড্ডীন হইল; পত্র-পুষ্পে শোভিত হইয়া গৌড়নগরী এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। সুধা-ধবলিত হর্ম্ম্যনিকর রজনীতে দীপমালায় আলোকিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে শোভাময় হইয়া উঠিল। বিজয়-দুন্দুভি-নিনাদ গৌড় নগরের মহোল্লাস জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

উড়িষ্যাজয়ের জন্য রাজীবলোচনের যুদ্ধযাত্রা।

নবাব-সেনাপতি রাজীবলোচন মুকুন্দদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার অভিপ্রায়ে, অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদা-তিক-সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই রণসজ্জা শেষ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। অশ্ব-ক্ষুরোত্থিত ধূলিরাশিতে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। ভীষণ রণবাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্রের ঝনৎকার শব্দ, বীরগণের হুঙ্কার-ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া, জনপদবাসী জনগণের মনে বিভীষিকা উৎপন্ন করিল। রাজীবলোচন প্রভঞ্জন-বেগে ত্রিবেণীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ত্রিবেণীতে মুকুন্দ দেবের একজন প্রতিনিধি রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি যখন শুনিলেন যে মহাবীর সমর-কুশল রাজীবলোচন নবাব সুলেমানের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছেন তখন তিনি রাজীব-লোচনকে কিছুমাত্র বাধা না দিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করি-লেন। রাজীবলোচন বিনাযুদ্ধে ত্রিবেণী অধিকার করি-লেন, এবং মুকুন্দ দেবের অধিকৃত বঙ্গদেশীয় সমস্ত স্থানে মুসলমান-বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া তাঁহার বল-পরীক্ষা করিবার জন্য উড়িষ্যা অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে তিনি তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা রাজা রুদ্রনারায়ণের রাজ্যমধ্যে আসিয়া পড়িলেন। কারণ উড়িষ্যা যাইতে হইলে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য অতিক্রম করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না। রাজীবলোচন তারকেশ্বরের চার, পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটী গ্রামে আসিয়া বিশ্রামার্থ সেনানিবাস স্থাপন করিলেন। তাঁহারই 'কালাপাহাড়' নামানুসারে ঐ গ্রাম অদ্যাপি পাহাড়পুর নামে বিখ্যাত এবং এখনও মুসলমানগণ ঐ গ্রামের প্রধান অধিবাসী।

রাজীবলোচন পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থান করিয়া আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন।

কালাপাহাড় যখন পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থান করিতে-

ছিলেন সেই সময়ে রাজা রুদ্রনারায়ণ, রাজীবলোচনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা গোপীরমণ এবং তাঁহার জননী, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। রাজীবলোচন সকলের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া সাশ্রু নয়নে বলিয়াছিলেন—"আমি কুলাঙ্গার, আমি যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই কুল উজ্জ্বল করিবার পরিবর্ত্তে তাহাতে কালি দিতে বসিয়াছি। আপনারা আমাকে ভুলিয়া যান। আমি মুকুন্দ দেবকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্যই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নবাব সুলেমানের শরণাপন্ন হইয়াছি। মা! আপনি আর এ অকৃতজ্ঞ অধম পুত্রের জন্য দুঃখ করিবেন না। আমি এখন অস্পৃশ্য যবন, আপনার পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতেও আজ অসমর্থ।" রাজীব-লোচনের এই কথা শুনিয়া কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। রাজা রুদ্রনারায়ণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "ভাই রাজু, তোমার অভাব আমরা কিরূপে সহ্য করিব? তুমি আমাদের আঁধার ঘরের মাণিক, দরিদ্রের অমূল্য নিধি। তোমার বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া মনে মনে কত আশা করিয়াছিলাম, মনে করিয়া-ছিলাম, একদিন বঙ্গ হইতে মুসলমান চিরতরে বিতাড়িত হইবে। কিন্তু বিধির অলঙ্ঘ্য শাসনে আজ সেই আশালতা সমূলে উৎপাটিত হইল। আজ মুসলমান্-রাজ তোমার

বাহুবলে হিন্দুরাজ্য ধ্বংস করিতে সমর্থ হইল। ভাই! তুমি আমায় কোন কথা না বলিয়া সুলেমানের শরণাপন্ন হইলে কেন? আমি গৌড় অধিকার করিয়া তোমায় নবাব কন্যা আনিয়া দিতাম। সামান্য একটী স্ত্রীলোকের জন্য বঙ্গের ভবিষ্যৎ চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল! ভাই, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। নবাবকন্যা তোমারই সহিত রহিয়াছেন; চল, গৃহে গমন করি। তাঁহার বাসের উপযুক্ত প্রাসাদ আমি দামোদর-তীরে নির্ম্মাণ করিয়া দিব। তুমি মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। নবাবকন্যাও হিন্দুমত গ্রহণ করুন।"

রাজা রুদ্রনারায়ণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজীবলোচন বলিলেন,—"দাদা, মায়ার বশীভূত হইয়া আপনি এই সমস্ত কথা বলিতেছেন; আমায় ত্যাগ করিতে আপনাদের প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। কিন্তু দাদা, বলুন দেখি, মা কি নবাবকন্যার হস্তে জল গ্রহণ করিবেন? আমি যদি আপনাদের আত্মীয় না হইয়া অপর কেহ হইতাম, তাহা হইলে কি দেশের উপকারের আশায় আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন? দেশের মুখ চাহিয়া কি আমাকে সমাজে গ্রহণ করিতেন? তাহা হইলে, মুকুন্দ দেব নবাবকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন কেন? স্বদেশের প্রতি যদি তাঁহার

বিন্দুমাত্র মায়া থাকিত, তাহা হইলে তিনি আমাকে প্রাণান্তেও ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

আমি বেশ বুঝিয়াছি, হিন্দুজাতির অধঃপতন ভগবানের বাঞ্ছনীয়। তাহা না হইলে ভারতের কর্ম্মী-পুত্রগণ সামান্য ব্যক্তিগত অপরাধে সমাজচ্যুত হয় কেন? সমাজ-ধর্ম্মের এই কঠোর নিয়ম যত দিন না, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়, একটু শ্লথ হইতেছে, তত দিন ভারতের উন্নতির কোন আশা নাই। সেই জন্যই বোধ হয় ভগবান কৌশলে আমায় মুসলমান-পক্ষ অবলম্বন করাইলেন। এতদ্ভিন্ন, নবাব বিশ্বাস করিয়া তাঁহার মস্তক আমার করে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি কেমন করিয়া সেই মস্তক ছেদন করি। যে সুলেমান আমার গুণগ্রাম হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজকন্যা পর্য্যন্ত একজন ভিন্ন জাতীয় লোকের হস্তে অর্পণ করিতে পারেন এবং বিশ্বাস করিয়া সেনাপতি পদে বরণ করিতে পারেন, আমি জীবন ধারণ করিয়া কিরূপে তাঁহার সেই বিশ্বাস হনন করিব। দাদা! আমায় মার্জ্জনা করুন, চিরকালের জন্য আমায় ভুলিয়া যান, মনে করুন যেন আমি আপনাদের বংশে জন্ম গ্রহণ করি নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে ধর্ম্ম ও যে সমাজ সর্ব্বসাধারণকে আশ্রয় দিতে পারে না, সেই সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম ও স্বার্থপর সমাজকে পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে চিরকালের জন্য উন্মুলিত করিব, দেবালয় ভূমিসাৎ করিব, দেব-দেবীর মূর্ত্তি

চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া হিন্দুত্বের চিহ্ন পর্য্যন্ত ভারত হইতে দুরীভূত করিব। সঙ্কীর্ণহৃদয় ব্রাহ্মণবংশ ধ্বংস করিব। কিন্তু আপনি নির্ব্বিবাদে ও নিশ্চিন্তমনে রাজ্য শাসন করুন। আপনার রাজ্যে কোনরূপ উপদ্রব হইবে না।"

রাজীবলোচনের মুখে এই সকল কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা রুদ্রনারায়ণ হতাশ হইয়া অতি বিষণ্ণ-মনে সদলবলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজীবলোচনও সসৈন্যে উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তিনি অতি সাবধানতার সহিত ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য অতিক্রম করিতে লাগিলেন। রাজীবলোচনের কঠোর আদেশে তাঁহার সৈন্যগণ অতি শান্তভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। গো, ব্রাহ্মণ ও দেব-মন্দিরের উপর কোনওরূপ অত্যাচার হইল না। কালাপাহাড় ভারতের যে যে অংশে গমন করিয়াছেন তিনি সেই সেই স্থানেই হিন্দু-দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ ও ব্রাহ্মণগণের উপর মহা অত্যাচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছেন। কেবল মাত্র ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য তাঁহার ভীষণ অত্যাচার হইতে নিস্তার পাইয়াছিল। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় অতি প্রাচীন দেবমন্দির সকল মস্তকদেশে ভুরসুটের ব্রাহ্মণরাজগণের নাম ধারণ করিয়া অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এখনও গড় ভবানীপুরে মণিনাথের মন্দিরের উপর ১৩০৬ শকাব্দা

ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে সময়ে কালাপাহাড় উড়িষ্যা জয় মানসে ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহার বহুপূর্ব্বে ঐ সকল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালাপাহাড় স্বীয়-বংশ প্রতিষ্ঠিত ঐ সকল মন্দিরের উপর কোন্ প্রকার অত্যাচার করেন নাই। তিনি জননী ও জন্মভূমির নিকট শান্তভাবে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া, উড়িষ্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

উড়িষ্যা-বিজয় ও দেবমূর্ত্তি ধ্বংস।

কালাপাহাড় অসংখ্য আফ্গান অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের সেনাপতি হইয়া উড়িষ্যা জয় করিতে আসিতেছেন শুনিয়া উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দ দেব সৈন্য সংগ্রহ ও সমরসজ্জা করিতে লাগিলেন। শত্রু হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য উড়িষ্যাবাসী সমর্থ—ব্যক্তিগণকে সমরকৌশল শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন এবং রাজা রুদ্রনারায়ণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু রাজা রুদ্র-নারায়ণ উড়িষ্যারাজকে সাহায্য করিয়া মত্ত উগ্রপ্রকৃতি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজীবলোচনকে অসন্তুষ্ট করিতে সাহসী হইলেন না। কাজেই মহাবীর মুকুন্দ দেব একাকী উড়িষ্যার সীমান্ত দেশে সৈন্যসজ্জা করিয়া ভীষণ কালা-পাহাড়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কালাপাহাড় সসৈন্যে উড়িষ্যার সীমায় পদার্পণ করিলে ঘোর সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। তিন চার দিন ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল, অবশেষে মুকুন্দ দেব কালাপাহাড়ের লোকোত্তর প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া শত্রুহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। কালাপাহাড় বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া পুরীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জগন্নাথ দেবের পুরোহিতগণ যখন শুনিলেন যে রাজা মুকুন্দ দেব যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং কালাপাহাড় বিজয়মদোন্মত্ত ভীষণ আফগান-সৈন্য সমভিব্যাহারে পুরী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, তখন তাঁহারা মহাভীত হইয়া জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে উহা লইয়া চিল্কা হ্রদের নিকট কোন গুপ্তস্থানে মৃত্তিকাভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখিলেন। কালাপাহাড় মন্দিরমধ্যে জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া গুপ্তচর দ্বারা চতুর্দ্দিকে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণগণকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবমূর্ত্তি চিল্কা হ্রদের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে শুনিয়া তিনি সেই স্থান হইতে ঐ মূর্ত্তি আনাইলেন এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া একটী শকটে করিয়া ত্রিবেণী পাঠাইয়া দিলেন।

কালাপাহাড় উড়িষ্যার সমস্ত দেবমন্দির ও দেব-দেবি-

মূর্ত্তি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ত্রিবেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ত্রিবেণীর জাহ্নবীতটে সমবেত হিন্দুগণের সমক্ষে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তিতে অগ্নিসংযোগ করিতে অনুমতি দিলেন। কোন হিন্দু-ভক্ত এই বিসদৃশ দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া কৌশলে ও গোপনীয় ভাবে অর্দ্ধদগ্ধ দেবমূর্ত্তি গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন এবং তৎপরে জগন্নাথ দেবের পুরোহিতগণের হস্তে উহা অর্পণ করেন।

কালাপাহাড়ের গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ও ভীষণ অনুশোচনা।

কালাপাহাড এইরূপে উড়িষ্যা বিজয় করিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঘোর স্বার্থপরতা, দম্ভ ও অভিমান বশতঃ তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের যে মহা অনিষ্ট সাধন করিলেন, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। পাপকার্য্যের অনুশোচনায় তাঁহার জীবনের সমস্ত সুখ একেবারে তিরোহিত হইল। দুঃখের ঘনান্ধকারে হৃদয় আচ্ছন্ন হইল। অপ্সরানিন্দিতা পতিব্রতা নবাব-দুহিতা প্রাণপণ স্বামিসেবায় নিযুক্ত থাকিয়াও তাঁহার মানসিক অশান্তি দূর করিতে পারিলেন না। কালাপাহাড়ের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। ঘৃণা ও ভীতি-পূর্ণ 'কালাপাহাড়' নাম যখনই রাজীবলোচনের শ্রবণ-বিবরে

প্রবেশ করিত তখনই তিনি অত্যন্ত কাতর ভাবে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইতেন। এইরূপ অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে কালাপাহাড় মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

রাজা রুদ্রনারায়ণ মোগলপক্ষ অবলম্বন করিলেন।

সুলেমানের মৃত্যুর পর দায়ুদ খাঁ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দায়ুদ খাঁ বলদৃপ্ত হইয়া সম্রাট আক্‌বরের অধীনতা ত্যাগ করিলে সম্রাট দায়ুদকে শিক্ষা দিবার জন্য অসংখ্য সমরকুশল সৈন্যসমভিব্যাহারে সেনাপতি মুনায়েম খাঁকে গৌড় অভিমুখে প্রেরণ করেন। দায়ুদ খাঁ রাজা রুদ্র-নারায়ণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাজা, দায়ুদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দিল্লীশ্বর আক্‌বরের বিপক্ষতা-চরণ করিতে সাহসী হন নাই।

দায়ুদ খাঁ সম্রাটসৈন্যের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাস্ত হন এবং পলায়ন করিয়া উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশ আবার আক্‌বরের পদানত হয়।

দায়ুদের প্রার্থনা সত্ত্বেও রাজা রুদ্রনারায়ণ যে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন নাই, তজ্জন্য মহামতি আকবর, রুদ্র-নারায়ণের উপর অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা-

সূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এবং বঙ্গদেশীয় সমস্ত নরপতিগণের মধ্যে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠস্থান অর্পণ করিলেন। রাজা রুদ্র-নারায়ণও পাঠানদিগকে দমন করিবার জন্য বাদ্‌সাহ আক্‌-বরের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

পাঠান সর্দ্দার কতলু খাঁ ও রাজা রুদ্রনারায়ণ।

মোগল গৌরবরবি মহামতি আক্‌বর দ্বিতীয় পাণিপথ সমরে পাঠান সেনাপতি হিমুকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পাঠান-বীর্য্যবহ্নি একপ্রকার নির্ব্বাপিত করিয়াছেন। আক্‌বরের উদার রাজনীতি-গুণে ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসল্‌-মান্, পারসি প্রভৃতি জাতিগণ শ্রদ্ধাবনত হইয়া সমস্বরে তাঁহার মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছে। মহা অশান্তি ভারতের প্রায় প্রত্যেক নর-নারীকে বহুকাল ধরিয়া অত্যন্ত অস্থির করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে পরম-ন্যায়-পরায়ণ দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী, প্রজাবৎসল সম্রাটের আশ্রয়ে দেশীয় রাজন্যবর্গ ও প্রকৃতিপুঞ্জ পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছেন। উপযুক্ত হিন্দু প্রজাগণ উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্যে, এমন কি প্রধান সেনাপতিত্বে পর্য্যন্ত নিযুক্ত হইয়া রাজ্যের মঙ্গল বিধানে রত হইয়াছেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তারস্বরে আকবরকে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা," বলিয়া জগদীশ্বরের সহিত

সমান আসন প্রদান করিতেছে এবং তাঁহাকে অতুল সম্মানে সম্মানিত করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার নিকট অবনত-মস্তক হইয়া পড়িয়াছে। বিজয়লক্ষ্মী মহাবীর আকবরের পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময়ে বঙ্গের গগন-ভালে অশান্তিরূপ কালমেঘ দেখা দিল। বঙ্গদেশে আবার সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। বঙ্গের রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সম্রাটের মহত্ত্ব-গুণে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া বঙ্গাধিপ পাঠানবংশীয় দায়ুদ খাঁ ঈর্ষানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। বিলুপ্ত-পাঠানগৌরব পুনরুদ্ধার করিবার জন্য দায়ুদ খাঁ বিপুল বলসঞ্চয় করিয়া সম্রাট্ আকবরের অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং স্বাধীন নরপতিরূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। দায়ুদের এই গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য সম্রাট্ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধে দায়ুদ অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও বিজয়লাভে অসমর্থ হইলেন, এবং তিনি মহাসমরে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করতঃ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। তথায় তিনি ভগ্নহৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশ পুনরধিকার করিবার জন্য তিনি দেশীয় রাজগণের নিকট বারংবার সাহায্য প্রার্থনা করিলেও কোন রাজাই আকবরের বিরুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই।

এই সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে (আধুনিক ভূর্সুটে) ব্রাহ্মণবংশীয় রাজা রুদ্রনারায়ণ রাজত্ব করিতেছিলেন। মহারাজ রুদ্রনারায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিগণ প্রায় সকলেই গৌড়ের পাঠান-রাজগণের মিত্র ছিলেন। সেইজন্য দায়ুদ খাঁ রুদ্রনারায়ণের সাহায্য পাইবার বিশেষ আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ রুদ্রনারায়ণের জ্ঞাতি রাজীবলোচন রায় দায়ুদের পিতা স্থলেমান কররাণির চক্রান্তে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং হিন্দু-দেবদেবি-মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম লোপ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন; সেইজন্য রাজা রুদ্রনারায়ণ বঙ্গের পাঠান নৃপতিগণের উপর অতীব ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দায়ুদ খাঁ মহারাজ রুদ্রনারায়ণের নিকট সাহায্য প্রাপ্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এইরূপে ভগ্নহৃদয় হইয়া দায়ুদ খাঁ লোকান্তর গমন করিলে, কতলু খাঁ পাঠানসর্দ্দাররূপে উড়িষ্যা শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইনিও গড় ভবানীপুরের রাজা রুদ্রনারায়ণকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অনেক লোভ দেখাইলেন, অনেক ভয় প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই যখন রাজা রুদ্রনারায়ণ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন না তখন কতলু খাঁ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের

হিন্দু রাজ্যগুলি ও দুর্গসকল বলপূর্ব্বক হস্তগত করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মহাবীর রুদ্রনারায়ণের বহুসংখ্যক রণপোত দামোদর ও রোণ নদে সর্ব্বদা ভাসমান থাকিয়া শত্রুহস্ত হইতে ভূরিশ্রেষ্ঠকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত রাজার বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত ও রণনিপুণ যোদ্ধাও ছিল। যে স্থানে রাজার সৈন্যগণ বাস করিত, তাহা "নস্করডাঙ্গা" নামে অভিহিত হইত। এখনও রাজবলহাট নামক গ্রামের অনতিদূরে এই সুবিস্তৃত স্থান "নস্করডাঙ্গা" নামেই পরিচিত। এখন এ স্থান একটী বৃহৎ গ্রামে পরিণত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তমলুক, আমতা, উলুবেড়িয়া, খানাকুল, ছাওনাপুর প্রভৃতি স্থানে রাজার ছাউনী ছিল।

এই সমস্ত কারণে কতলু খাঁ রুদ্রনারায়ণের রাজ্য প্রথমে আক্রমণ করা সমীচীন বলিয়া বোধ করিলেন না। তিনি রুদ্রনারায়ণের রাজ্যের পশ্চিম দিক্‌ দিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সংবাদ পাইয়া রাজাও তাঁহার রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্ত সশস্ত্র সৈন্যগণের দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া ফেলিলেন।

কতলু খাঁ সসৈন্যে বঙ্গদেশে অগ্রসর হইতেছে সংবাদ পাইয়া মহামতি আকবর অম্বররাজ মানসিংহের পুত্র জগৎ সিংহকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন এবং বিষ্ণুপুর

রাজ ও ভূরসাট্ট-রাজ রুদ্রনারায়ণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, যদি তাঁহারা কতলু খাঁর বিরুদ্ধে সম্রাটের সাহায্য করেন, তাহা হইলে সম্রাট্ চিরকাল তাঁহাদিগকে মিত্র বলিয়া গণ্য করিবেন।

কতলু খাঁ উত্তরাভিমুখে গমন করিতে করিতে গড় মান্দারণে উপস্থিত হইলেন। ভয় প্রদর্শন করিয়া মান্দারণ-দুর্গাধিপতিকে স্বদলে আনয়ন করিবার জন্য কতলু খাঁ সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুতেই যখন কিছু হইল না, তখন স্বদলবলে গড় আক্রমণ করিলেন। ভাগ্যক্রমে জগৎসিংহ সেই সময়ে জাহানাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কতলু খাঁর সেনার পশ্চিম ভাগ আক্রমণ করিলেন। জগৎসিংহকে সাহায্য করিবার জন্য উত্তরদিকে বিষ্ণুপুর রাজ ও পূর্ব্বদিকে রাজা রুদ্রনারায়ণের বহুসংখ্যক রণকুশল সৈন্য কতলু খাঁর সৈন্যদলকে আক্রমণ করিল। ভীষণ সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। এই অনলে উভয়-পক্ষীয় বহু সৈন্যের সহিত কতলু খাঁ ও মান্দারণ-দুর্গাধিপতি ভস্মীভূত হইলেন। মোগল সেনাপতি জগৎসিংহ যুদ্ধে আহত হইলে পর, বিষ্ণুপুর রাজ, পাঠান সেনানায়ক ওস্মানের হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া অতি সতর্কতার সহিত নিজ রাজ্যে লইয়া যান এবং সযত্নে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করেন। পাঠানসর্দ্দার কতলু খাঁ

নিহত হইলে, সেনাপতি ওস্‌মান স্বদলবলে উড়িষ্যা অভিমুখে প্রস্থান করেন।

মান্দারণের যুদ্ধের পর রাজা রুদ্রনারায়ণের বৈরাগ্য।

এই যুদ্ধে বহু হতাহত ও সাধারণ জনগণের অত্যন্ত দুঃখকষ্ট দেখিয়া রাজা রুদ্রনারায়ণের প্রাণে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি এক্ষণে যৌবনাবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ে পদার্পণ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার পুত্রাদি জন্মগ্রহণ করে নাই। সুতরাং তিনি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার দীক্ষাদাতা গুরু শিবপ্রতিম হরিদেব ভট্টাচার্য্যের উপদেশে তিনি কাটশাঁকড়া নামক গ্রামে এক শিবমন্দির স্থাপন করিয়া শিবের আরাধনায় নিযুক্ত হয়েন। আমতার নিকটবর্ত্তী কাটশাঁকড়া গ্রামে এই রুদ্রনারাণ শিবমন্দির অতীতের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া অদ্যাপি বিরাজমান রহিয়াছে। রাজা শিবমন্দিরের নিকটেই এক প্রকাণ্ড সরোবর খনন করান। এখনও এই দীর্ঘিকা অগাধ জলরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া গ্রামবাসি-জনগণের জলকষ্ট নিবারণ করিতেছে।

রাজা রুদ্রনারায়ণের সহৃদয়তা।

কথিত আছে, রাজা একদিন ব্রাহ্মণভোজন করাইতেছেন। ব্রাহ্মণগণ সকলেই নানাবিধ উপাদেয় রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছেন। রাজা গলবস্ত্র হইয়া নগ্নপদে ভোজন ব্যাপার স্বয়ং পরিদর্শন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ-কর্ম্মচারিগণ চতুর্দ্দিকে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে এক রুক্ষকেশা, জীর্ণা-শীর্ণা-ভিখারিণী একটী ক্ষুধাতুর শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া কিছু খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করিবার জন্য সেইস্থানে উপস্থিত হইল। প্রহরিগণ দূর্ দূর্ করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হইল, ক্রোড়স্থিত শিশুটী "মা আমায় খাবার দেনা, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে" বলিয়া ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিতে লাগিল। ভিখারিণী প্রহারের ভয়ে গলদশ্রুলোচনে যতই দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, বালক ততই কাতরকণ্ঠে "মা আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, আমায় খাবার দেনা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হৃদয়-বিদারক চীৎকার করিতে লাগিল। সেই কাতর-চীৎকারে কাহারও হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র উদয় হইল না। সকলেই এমন কি ভোজনরত বিপ্রগণ পর্য্যন্তও ভিখারিণীকে দূর্ দূর্ করিতে লাগিলেন। ভিখারিণী বিতাড়িত হইয়া অদূরে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলে, সশস্ত্র প্রহরিগণ তথায় গমন

করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। ভিখারিণী বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ক্ষুধাতুর পুত্রের জন্য বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে কিছু খাদ্য-সামগ্রী ভিক্ষা করিল। প্রহরিগণ তখন রোষ-কষায়িত-নেত্রে বলিতে লাগিল,—"কি পাজী মাগী, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, এখনও ব্রাহ্মণভোজন শেষ হয় নাই, তুই এরই মধ্যে খাবার চাস্? এখনও বলিতেছি, তুই এস্থান হইতে দূরহ, নচেৎ এখনই তোর মস্তক ছেদন করিব।" এই কথা শুনিয়া ভিখারিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "বাপ্ সকল! আমি ব্রাহ্মণভোজনের পূর্ব্বে কোন খাদ্যদ্রব্য চাই না। ব্রাহ্মণভোজনের পর যে সকল উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ফেলিয়া দেওয়া হইবে, শৃগাল কুক্কুরের সহিত আমি তাহারই অংশ গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইব; কিন্তু আমার শিশু-সন্তানটী ত জানে না যে, ব্রাহ্মণভোজনের পূর্ব্বে তাহাকে খাইতে নাই। অধিকন্তু সে প্রাতঃকাল হইতে কিছুই খাইতে পায় নাই। বাপ্ সকল, দয়া করিয়া আমার ছেলেটীকে কিছু খাবার দাও, নচেৎ কিছুতেই আমি ইহাকে শান্ত করিতে পারিতেছি না।

ভিখারিণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যমদূতাকৃতি জনৈক প্রহরী শিশুর হস্ত ধরিয়া যেমন বলিয়া উঠিল, "এই তোর ছেলেকে চিরকালের জন্য শান্ত করিয়া দিতেছি", অমনি শিশুটী প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

মাতার আর্ত্তনাদে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। রাজার দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষিত হইল, "কি হইয়াছে" বলিয়া রাজা চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রহরী একটী বালকের হস্ত ধরিয়া আছাড় মারিতে যাইতেছে, দূর হইতে দেখিয়া রাজা অতি ক্রুদ্ধস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "স্থির হও, বালকের হস্ত পরিত্যাগ কর।" রাজার রুষ্ট-কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া প্রহরী বালকের হস্ত ছাড়িয়া দিয়া যোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইল। বালক প্রাণভয়ে ধূল্যবলুণ্ঠিতা মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইল। রাজা দ্রুতগতিতে ভিখারিণীর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার কি হইয়াছে? তোমার বালককে এই প্রহরী ধরিয়াছিল কেন? ভিখারিণী রাজার পদতলে লুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল "মহারাজ! আমি ও আমার পুত্র ঘোর অপরাধী"। দুরন্ত শিশু ক্ষুধার জ্বালায় আমার নিকট খাবার চাহিতেছিল, আমি মায়ায় অন্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ-ভোজনের অগ্রেই কিছু খাদ্য-ভিক্ষা করিয়াছিলাম। দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা আপনি! এরূপ কুকার্য্য আর কখনও করিব না; ধর্ম্মাবতার! আপনি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া এই অনাথ বালকের প্রাণভিক্ষা দিন"। আমি আমার অঞ্চলের নিধিকে লইয়া দূরদেশে এখনই পলায়ন করিতেছি।"

রাজা ভিখারিণীর এই সকরুণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র বারিধারা বহিতে লাগিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল, দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল; রাজা ভূমির উপর বসিয়া পড়িলেন। পার্শ্বচরগণ রাজার এই অবস্থা দেখিয়া ত্রস্ত-ভাবে তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিল। রাজা একটু প্রকৃতিস্থ হইলে অনাথবালককে স্বীয় বক্ষে তুলিয়া লইয়া মুখ-চুম্বন করিলেন এবং ভিখারিণীকে বাষ্পাকুল-লোচনে বলিতে লাগিলেন, "মা গো! তোর কিছু অপরাধ নাই, আমারই মহা অপরাধ হইয়াছে। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর্। চল্ মা, আমার ভাণ্ডারে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত আছে, তন্মধ্যে তোর পুত্র যাহা কিছু খাইতে চায়, তাহা তুই নিজহস্তে তাহার মুখে তুলিয়া দিয়া হৃদয়ের দুঃখ দূর কর। নচেৎ কিছুতেই আমি শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।" এই বলিয়া রাজা ভিখারিণী-পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন—ভিখারিণী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

ভাণ্ডারদ্বারে উপনীত হইয়া রাজা বালককে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিলেন, এবং ভাণ্ডারীকে বলিয়া দিলেন যে, এই বালক ও বালকের মাতা যে সকল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তুমি তদ্দণ্ডে ইহাদিগকে তাহা

প্রদান করিবে। তৎপরে ভিখারিণী ও তাহার পুত্র উদর পূর্ণ করিয়া নানা সুখাদ্য আহার করিল এবং প্রচুর খাদ্য-দ্রব্য লইয়া গৃহ গমন করিল। রাজা রুদ্রনারায়ণের হৃদয় কত উন্নত, কত মমতাপূর্ণ ও কত পরার্থপর ছিল—তাহা এই প্রবাদগল্পের দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ।

ব্রাহ্মণভোজনাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। কোলাহল-পূর্ণ নাট্যমন্দির নিস্তব্ধ হইয়াছে। দিনমণি পশ্চিম-গগণে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। দুই একজন প্রহরী ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাজা একাকী মন্দির-দ্বারে উপবিষ্ট। রাজার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সুন্দর মুখমণ্ডলে যেন এক গুরুতর চিন্তার রেখাপাত হইয়াছে। অন্যমনা হইয়া তিনি যেন কি ভাবিতেছেন। এমন সময়ে হঠাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন জলদগম্ভীরস্বরে বলিতেছে, "রাজন্, চিন্তিত হইবেন না ; আপনার বংশ লোপ হইবে না, কীর্ত্তিমান্ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার বংশ উজ্জ্বল করিবে"। এই বাক্য রাজার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি চকিত-নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন—সম্মুখে আপাদলম্বি-জটাজুট-মণ্ডিত-মস্তক, দীর্ঘায়তবপু, রুদ্রাক্ষমালা-বিভূষিত-কণ্ঠ, শান্তোজ্জ্বল-বদনমণ্ডল, প্রদীপ্ত-চক্ষু, ত্রিশূলপাণি, পরিহিতরক্তবস্ত্র এক সন্ন্যাসিমূর্ত্তি। রাজা

সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া মহাপুরুষের পদতলে মস্তক লুণ্ঠিত করিলেন। সন্ন্যাসী সস্নেহে রাজার হস্ত ধারণ করিয়া উত্তোলন করিলেন। পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদানান্তর সন্ন্যাসীর পাদ-বন্দনা করিয়া রাজা তাঁহাকে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট করাইলেন এবং বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাত্মন্! আমি এখনই যে আশীর্ব্বাদ-বাণী শ্রবণ করিলাম, তাহা বোধ হয় আপনারই শ্রীমুখনিঃসৃত। কিন্তু আমি ও আমার জায়া উভয়েই ত বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইলাম, এতকাল পরে সন্তানোৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে! তবে আপনার আশীর্ব্বাদে অসম্ভবও সম্ভব হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমার হৃদয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা যে আপনি অধীনের গৃহে কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া অধীনকে চরিতার্থ করেন।"

সন্ন্যাসী সহাস্যবদনে বলিতে লাগিলেন, "রাজন্, আপনি ধন্য! আপনার অমৃতোপম খাদ্য আজ বিশ্বপতি নিজে গ্রহণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন। আজ আপনি প্রকৃত ক্ষুধাতুরের মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়াছেন। দরিদ্রের মুখেই ভগবান্ আহার করিয়া থাকেন। রাজন্! আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না। অপেক্ষা করিবার আমার অধিক সময় নাই। দুই একটী কথা বলিবার জন্যই আমি আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

আপনার বর্ত্তমান পত্নীর গর্ভে সন্তানোৎপত্তি হইবে না; আপনি দ্বিতীয় দারগ্রহণ করুন। সেই স্ত্রীর গর্ভে আপনার কুলপাবন পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। আপনার রাজ্যাধিকার মধ্যেই কোন তেজস্বি-ব্রাহ্মণবংশে আপনার উপযুক্তা নারী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মহাশক্তি-শালিনী রমণী। সেই রমণীরত্ন লাভ করিয়া সফলমনোরথ হউন।”

সন্ন্যাসী এই কথা বলিয়াই রাজসকাশ হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। নানাপ্রকার চিন্তাতরঙ্গে তাঁহার মন আলোড়িত হইতে লাগিল। যদিও তাঁহার হৃদয়ে একটী পুত্র লাভের বাসনা বলবতী ছিল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় দারগ্রহণে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। সন্ন্যাসীর আদেশক্রমে কার্য্য করিবেন কি না, তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মনোমধ্যে ননাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুই মীমাংসা করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অতঃপর পণ্ডিতাগ্রগণ্য, মহাশক্তির উপাসক, প্রধান-পরামর্শদাতা গুরুদেব হরিদেব ভট্টাচার্য্যের উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য দ্রুতগামী তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া গুরুর আবাসভূমি দেবীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গুরুগৃহে।

সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছেন। বিহঙ্গগণ বৃক্ষ-শাখে সুখাসীন হইয়া সন্ধ্যার আগমনগীতি গান করিতেছে; কুলবধূগণ গৃহপ্রাঙ্গন সম্মার্জ্জিত ও গঙ্গাজলে পবিত্রীকৃত করিয়া সন্ধ্যাদেবীর সম্বর্দ্ধনাহেতু দীপদান ও শঙ্খধ্বনি করিতেছে। সন্ধ্যাদেবী অসংখ্য-হীরকখচিত-তিমির-বসন পরিধান করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। দেবালয়ে ব্রাহ্মণগণ তারস্বরে সুমধুর স্তব পাঠ করিতেছেন; আরতির সময় শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরের শব্দে গ্রাম সকল আনন্দশব্দ-পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময়ে রাজা রুদ্রনারায়ণ অশ্বারোহণে দেবীপুরে উপস্থিত হইলেন। কাটশাকড়া হইতে দেবীপুর প্রায় ছয় মাইল। এই ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিতে রাজার প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিল। রাজা দেবীপুর গ্রামে প্রবেশ করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং পদব্রজে গুরুগৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। রাজা যখন গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন গুরুদেব সন্ধ্যাবন্দনায় নিযুক্ত। রাজাও দেবমন্দিরে গমন করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিলেন এবং তৎপরে গুরুদেবের পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত হইলে গুরুদেব অসময়ে রাজার

আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা সন্ন্যাসীর সমস্ত কথা যথাযথ বর্ণনা করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। গুরুদেব রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বৎস! আমি তোমার বাক্যশ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি। সন্ন্যাসীর অমোঘ আশীর্ব্বাদে তুমি নিশ্চয়ই পুত্ররত্ন লাভ করিবে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সন্ন্যাসীর যেরূপ মূর্ত্তি বর্ণনা করিলে তাহাতে নিশ্চয়ই তিনি একজন মহাপুরুষ। তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তোমাকে অবশ্যই দ্বিতীয় দারগ্রহণ করিতে হইবে। তুমি কালবিলম্ব না করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে কৃতনিশ্চয় হও।"

গুরুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অতি নম্রভাবে বলিতে লাগিলেন—"ভগবন্! এই বয়সে আবার আমাকে সংসারজালে আবদ্ধ হইতে আদেশ করিতেছেন কেন? আমি ত রূপবতী ও গুণবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া যথেষ্ট সুখ-সম্ভোগ করিয়াছি। সে সুখভোগে আমার মন আর ধাবিত নহে। আমি আর নশ্বর সুখ চাহিনা, গুরুদেব! আমি আর রাজ্য চাহিনা, ধন চাহিনা, পার্থিব সুখের জন্য আমি লালায়িত নহি। ভগবন্! আমি সেই সুখ চাই যে সুখের ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই; সেই সুখের জন্য আমার চিত্ত সদা উন্মত্ত, যে সুখভোগে কখনও অবসাদ আসে না; যে সুখস্রোতে ভাসমান হইলে, ত্রিতাপ চিরতরে দূরে পলায়ন

করে। যত দিন না আমি সেই আনন্দ লাভ করিতে পারি, ততদিন চিরানন্দময়ীর অভয়চরণ-যুগল হৃদয়ে প্রতিনিয়ত ধ্যান করিব, ইহাই আমার একান্ত বাসনা।”

রাজার দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহণে অনিচ্ছা দেখিয়া গুরু-দেব বলিতে লাগিলেন, ”বৎস! তুমি অপুত্রক। পুত্রের জন্যই লোকে ভার্য্যাগ্রহণ করে—ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে। সুখভোগ করিবার জন্য তোমাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতেছি না। সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ-ক্রমে দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইলে তুমি পুন্নামনরক হইতে রক্ষা পাইবে এবং তোমার পিতৃঋণ পরিশোধ হইবে। তুমি সংসারাশ্রমী রাজা। রাজ্যের মঙ্গলচিন্তা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে তুমি অচিরে দ্বিতীয় দারগ্রহণ কর, অন্যথা করিও না। মহর্ষিগণও পুত্রোৎপত্তির জন্য দারগ্রহণ করিতেন। ইহাতে সংসারীর অবশ্য কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয়, অধর্ম্ম হয় না। গুরুদেবের এই বাক্যে রাজা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন এবং গুরুচরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রাসাদাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রাণী ভবশঙ্করীর (রায় বাঘিনীর) বাল্যজীবন।

পেঁড়োর গড়ের অনতিদূরে দীননাথ চৌধুরী নামক

এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই ব্রাহ্মণ পেঁড়োদুর্গাধিপের অধীনে একজন সর্দ্দার ছিলেন। দীননাথ দীর্ঘকায় ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ। তিনি অশ্বারোহণে ও অস্ত্রশস্ত্রচালনায় এরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন যে তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ রণকুশল বীরপুরুষ বঙ্গদেশে অতি অল্পই বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার রাজদত্ত সুবিস্তৃত জায়গীর ছিল। তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে সমস্ত সমর্থ ব্যক্তিকেই যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষিত করিতে তিনি বাধ্য করিতেন। তাঁহার অধীনে সহস্রাধিক যোদ্ধা থাকায় তিনি রাজ্য মধ্যে একজন ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মধ্যে পরিগণিত হইতেন। সংসারে তাঁহার একটী কন্যা ও একটী পুত্র ছিল।

এই কন্যাই আমাদের বীরা রাণী ভবশঙ্করী। দীননাথের পত্নী পুত্রটীকে প্রসব করিয়াই ইহলীলা সম্বরণ করেন। সুতরাং দীননাথ শিশু পুত্রের লালন পালনের ভার এক বিশ্বস্ত ধাত্রীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। কন্যাটী মাতৃবিয়োগের পর হইতে পিতার এতই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল যে সর্ব্বদাই সে পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। দীননাথ যে স্থানে গমন করিতেন, কন্যা ভবশঙ্করীকে অশ্বের উপর স্বীয় পার্শ্বে বসাইয়া সেইস্থানেই লইয়া যাইতেন। তিনি কন্যাকে সর্ব্বদা পুরুষোচিত যোদ্ধ-বেশে সজ্জিত রাখিতেন এবং অস্ত্রশস্ত্র চালনায় শিক্ষিত করিতেন।

এইরূপে ভবশঙ্করী বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যে যেরূপ মনোহারিণী, যুদ্ধ বিদ্যাতেও সেইরূপ পারদর্শিনী হইয়া উঠিলেন। দীননাথ কন্যাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন, এক দণ্ডও চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না; সেইজন্য বাল্যাবস্থায় তাঁহার বিবাহকথা একেবারে মনেই স্থান দেন নাই। লাবণ্যময়ী কন্যার যৌবনের প্রথম উন্মেষে দীননাথ তাহার বিবাহের জন্য একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভবশঙ্করী নানা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এত উচ্চাভিলাষিণী হইয়াছিলেন যে সাধারণ লোকের অঙ্কশায়িনী হওয়া অত্যন্ত অপমানজনক বিবেচনা করিতেন; তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যদি কখনও উপযুক্ত পতিলাভ হয় তবেই বিবাহ করিবেন, নচেৎ আজন্ম কুমারী থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিবেন।

পিতা যখন তাঁহার বিবাহের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি কোনও প্রকারে তাঁহার এই মত পিতার গোচরে আনয়ন করেন। দীননাথেরও প্রাণে একান্ত বাসনা যে এরূপ সর্ব্বসদ্‌গুণ-বিভূষিতা সৌন্দর্য্যময়ী কন্যা রাজবংশীয় কোন বীরপুরুষের হস্তে অর্পণ করেন। সেইজন্য তিনি কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলেন না। কন্যার যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, দীননাথ ততই তাহাকে নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিতা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ভবশঙ্করী রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতিতে সম্পূর্ণ অভীজ্ঞা ও যুদ্ধ-বিদ্যায় সুনিপুণা হইয়া উঠিলেন। যৌবনে তাঁহার সুগঠিত দেহের লাবণ্যচ্ছটা তাঁহার বরবপুকে এক অপূর্ব্ব শোভায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। রক্তবস্ত্রপরিধানা এই রমণীমূর্ত্তি যখন শূলহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন তখন মনে হইত যেন মহেশমনোমোহিনী, মহাশক্তিরূপিণী, মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা দনুজদলন করিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

হে বঙ্গবাসিজনগণ! একবার মনশ্চক্ষে এই বঙ্গবাসিনী বীরা রমণীর সুমোহন রূপ দেখিয়া জীবন সফল করুন। এমন রূপ কি আর কখনও দেখিবেন? এমন রমণীমূর্ত্তি কি যোদ্ধবেশে অশ্বপৃষ্ঠে আর কখনও বঙ্গদেশে আবির্ভূতা হইবে? যে বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি শক্তিমূর্ত্তির উপাসনা হইয়া থাকে, সেই বঙ্গদেশে কি শক্তিরূপিণী রমণীগণ চিরকাল শক্তিহীনা অবলা হইয়াই থাকিবেন? বঙ্গবাসিগণ কি আর কখনও তাহাদিগকে মহাশক্তির অংশভূতা ও বরাভয়দাত্রী রূপে নিরীক্ষণ করিয়া জীবন সার্থক করিবার অবসর পাইবে না? তাহারা চির-কালই কি মৃন্ময়ী শক্তিমূর্ত্তির উপাসনা করিয়া আপনাদিগকে ধন্যজ্ঞান করিবে? হিন্দুশাস্ত্র নারীকে শক্তি-রূপিণী বলিয়া গিয়াছেন কিন্তু আমরা এই শক্তিরূপিণী রমণীগণকে বিলা-

সিনী করিয়া তুলিয়াছি। আমরা শক্তির প্রকৃত উপাসনা না করিয়া কার্য্যতঃ ইহাকে পদদলিত করিয়া আসিতেছি, শাস্ত্রের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আমরা প্রমাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। কাযেই আমাদের মহাশক্তিরূপিণী নারিগণ আজ শক্তিহীনা। আমরা জীবন্তে মৃত।

ভবশঙ্করীর পিতৃবংশ।

ভবশঙ্করীর পিতা দীননাথের বাস্তুভিটা এখনও পেঁড়োরগড়ের অনতিদূরে পতিত অবস্থায় রহিয়াছে। তাঁহার বংশীয় যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী আমতার নিকটবর্ত্তী খোসালপুর গ্রামে একণে বাস করিতেছেন। তিনি ভারতের মধ্যপ্রদেশে একজন ধনী কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী। এই যোগেন্দ্র বাবু নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত। তিনি বিদ্বান্, দয়ালু, দাতা ও পরোপকারী। নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া পরের উপকার করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত নহেন। বীরা রাণী ভবশঙ্করীর পিতৃবংশের বংশধর যোগেন্দ্র বাবু স্বীয় বংশের গৌরব রক্ষা করিয়া বঙ্গদেশের মুখ যেন উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হয়েন।

কুমারী ভবশঙ্করীর সহিত রাজা রুদ্রনারায়ণের সাক্ষাৎ।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, দামোদর নদের শাখা রোণের তটভূমি তৎকালে ঘন অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। এই অরণ্যে বন্যবরাহ, বন্যমহিষ, হরিণ প্রভৃতি পশুগণ অবাধে বিচরণ করিত। এক দিবস ভবশঙ্করী এক বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া বর্ষাহস্তে অরণ্যের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটী হরিণ বৃক্ষপত্র ভক্ষণ করিতেছে। হরিণটীকে দেখিয়া বীরা রমণী সেই দিকে অশ্বচালনা করিলেন।

তুরঙ্গের ক্ষুরোত্থধ্বনিতে মৃগ চমকিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়নপর হইল। ভবশঙ্করীও হরিণকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। অশ্বগমনের দড়্‌বড়্ শব্দে বনের পশুগণ ত্রাস্ত হইয়া উঠিল। পক্ষিগণ নিশ্চিন্তমনে বৃক্ষশাখে উপবিষ্ট ছিল, তাহারা এই শব্দে ভীত হইয়া আকাশে উড়িতে উড়িতে কলরব করিতে লাগিল; দুর্ব্বল বন্য-প্রাণিগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

কুমারী যখন মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে নদী-খাতের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তখন মৃগটী তাঁহার

নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ায় তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থিত বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। অব্যর্থ সন্ধানে মৃগ আহত হইল। ভবশঙ্করী মৃগের নিকটে গমন করিয়া বর্শাটী তাহার দেহ হইতে উত্তোলন করিয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তিন চারিটা প্রকাণ্ড বন্যমহিষ নদিজল হইতে উঠিয়া অতি রোষভরে গ্রীবা বক্র করিয়া তাঁহার অশ্বকে আক্রমণ করিবার জন্য বেগে অগ্রসর হইতেছে।

ইহা দেখিয়া কুমারী প্রথমে একটু ভীতা হইয়া পলায়ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু ক্ষণপরেই তাঁহার বীর-হৃদয় হইতে ভয় দূরীভূত হইল। তিনি দৃঢ়-হস্তে বর্শা ধারণ করিয়া এরূপ তেজের সহিত সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী মহিষটার প্রতি ইহা নিক্ষেপ করিলেন যে, বিপুল বলশালী মহাকায় পশু ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিশায়ী হইল। ভবশঙ্করী অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার শরীর হইতে বর্শা উত্তোলন করিয়া লইলেন, এবং এরূপ দক্ষতার সহিত অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন যে, দুর্দ্দান্ত ক্রুদ্ধ পশুগণ তাঁহার অশ্বকে কিছুতেই আঘাত করিতে সমর্থ হইল না। একে একে তিনি মহিষগুলিকে কৌশলের সহিত নিহত করিয়া শেষ মহিষটার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার সুবর্ণ-বর্ণ-গঞ্জিত ললাটতলে মুক্তাফল সদৃশ ঘর্ম্মবিন্দু সকল শোভা পাইতে লাগিল, মদনচাপ সদৃশ মনোহর ভ্রূযুগ

কুঞ্চিত হইল, রোষে চক্ষুর্দ্বয় রক্তিমাভা ধারণ করিল। তিনি এক হস্তে অশ্বের রশ্মি আকর্ষণ করতঃ অশ্ব হইতে ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়া অন্য হস্তে বর্শা লইয়া সেই উন্মত্ত পশুর গ্রীবা ছিন্নভিন্ন করিলেন।

রাজা রুদ্রনারায়ণ এক দ্রুতগামী ছিপে আরোহণ করিয়া কাটশাঁকড়া শিবমন্দির অভিমুখে গমন করিতে-ছিলেন। যে সময়ে ভবশঙ্করী ক্রোধোন্মত্ত মহিষের গ্রীবা-দেশ বর্ষা দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে রাজার তরণী কিয়দ্দূরে দৃষ্ট হইল। রাজা দূর হইতে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তদভিমুখে শীঘ্র তরি-চালনা করিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞামাত্র তরণী বায়ু-বেগে তটনিকটে আনীত হইল। রাজা একলম্ফে তীরে অবতরণ করিলেন এবং মহাশক্তিশালিনী যুবতী রমণীর অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত অবস্থায় বিমুগ্ধনেত্রে কিছুক্ষণ সেই সুন্দরী কামিনীর রোষ-বিস্ফারিত নয়ন-যুগলের এবং গর্ব্বোদ্দীপ্ত আরক্তিম মনোহর বদন-মণ্ডলের প্রতি নির্ণিমেষে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরেই রাজা স্বীয় মানসিক দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইয়া আত্মসংবরণ করিলেন এবং স্নেহপূর্ণ গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"রমণি! তুমি কে? তোমাকে দেখিয়া উচ্চ-বংশোদ্ভবা বলিয়া অনুমান হয়।

"তুমি কি জন্য এই গহন অরণ্যে একাকিনী এই অসমসাহসিক কার্য্যে নিযুক্তা হইয়াছ? তোমার অশ্বারোহণ-দক্ষতা ও অস্ত্র-চালনা দেখিলে বোধ হয়, তুমি যুদ্ধবিদ্যার সুনিপুণা। তোমার জন্মভূমি কোথায়? তুমি কি কোন ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভবা রমণী?" রাজার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ভবশঙ্করী নির্ব্বাক্ হইয়া নিজ অশ্বপৃষ্ঠে স্থিরভাবে উপবিষ্টা রহিলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, যেন তিনি একজন অপরিচিত পুরুষের এই সকল প্রশ্নে অসন্তুষ্টা হইয়াছেন। কিন্তু প্রশ্নকারীর রাজোচিত পরিচ্ছদ দেখিয়া, তাঁহার কথার কি উত্তর দিবেন ভাবিতে লাগিলেন।

রাজা স্বীয় প্রশ্নের কোন উত্তর না পাইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "রমণি! বুঝিয়াছি তুমি আমার কথার উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছ। আমার এই অনধিকার-চর্চ্চায় বোধ হয় তুমি মনে মনে কিছু বিরক্তও হইয়া থাকিবে। জানি, বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকগণ অপরিচিত কোন পুরুষের সহিত আলাপ করিতে কুণ্ঠিতা হয় কিন্তু ইহাও জানি যে তাহারা মহাবিপৎপাতের সম্ভাবনা ব্যতিরেকে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে কখনও লোকলোচনের সম্মুখীন হয় না।"

রাজার এই সকল কথা শুনিয়া ভবশঙ্করী আর

নির্ব্বাক্ থাকিতে পারিলেন না। তিনি ধীরকোমলস্বরে মস্তক অবনত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তিন, চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার আমাদের রাজাকে কাট্‌শাকড়া শিব-মন্দিরে দর্শন করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে আপনিই আমাদের রাজা। অত্যন্ত উত্তে-জিত অবস্থায় আপনাকে দেখিয়া প্রথমে চিনিতে পারি নাই। তজ্জন্য আপনার কথায় আমি একটু অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছিলাম। এক্ষণে যুক্তকরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, দয়া করিয়া প্রগল্‌ভা নারীর সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়া চলিয়া যাইব; আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না।"

এই বলিয়া ভবশঙ্করী ব্রীড়াবনতমুখী হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি ক্ষত্রিয়কুমারী নহি; আমি ব্রাহ্মণকন্যা। আপনার রাজ্যাধিকারমধ্যেই আমার জন্মভূমি। আমার পিতা শ্রীযুক্ত দীননাথ চৌধুরী। অত্যন্ত স্নেহ বশতঃ তিনি আমাকে কিঞ্চিৎ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন। অস্ত্র-শস্ত্র চালনার চর্চ্চা রাখিবার জন্য আমি মধ্যে মধ্যে মৃগয়ায় বহির্গত হই। কিন্তু একাকিনী রমণীর মৃগয়াচ্ছলে এই গহন অরণ্যমধ্যে আগমন অত্যন্ত নির্বুদ্ধির কার্য্য হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া ভবশঙ্করী নৃপচরণে প্রণতা হইলেন এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া সেই স্থান হইতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দীননাথ চৌধুরীর নিকট রাজার দূত প্রেরণ।

ভবশঙ্করী চলিয়া যাইবার পরও কিছুক্ষণ রাজা চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নির্ব্বাক্ ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ভব-শঙ্করীর সুগঠিত মনোরম দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে একটু হেলিয়া পড়িয়াছে এবং বীরনারী সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত ও প্রবালগঞ্জিত অধর মুক্তোজ্জ্বল দন্তপাতি দ্বারা দংশন করিয়া করিকরসুদৃঢ়হস্তে রোষবক্রগ্রীব মহিষকে সুতীক্ষ্ণ বর্ষার দ্বারা বিদ্ধ করিতেছে, এই দৃশ্য রাজার মানস-পটে তখনও চিত্রিত ছিল।

রাজা ভাবিতে লাগিলেন দেবগণশক্তিসমুদ্ভবা দশভুজা বুঝি আবার অসুরনিধনকারণ ভূলোকে অবতীর্ণা হইয়া-ছেন। এইরূপ তন্ময়চিত্তে ভবশঙ্করীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল। পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া রাজা পুনরায় নৌকারোহণ করিলেন।

নৌকা কাটশাকড়া অভিমুখে ছুটিল। অল্পক্ষণ পরেই রাজা শিবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেবমূর্ত্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং চিত্তস্থির করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু বীরা নারীর চিন্তা কিছুতেই

তাঁহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইল না। অনন্তর রাজা ঐ তেজস্বিনী সুন্দরী রমণীর বিষয় সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য, দীননাথ চৌধুরীর নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। তিনি দূতকে এই কথা বলিয়া দিলেন যে রাজা রুদ্রনারায়ণ কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক। যতশীঘ্র সম্ভব তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন।

দূত প্রভঞ্জনগতিতুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া দীননাথের গৃহাভিমুখে ছুটিলেন এবং যথাসময়ে তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রতিহারীর দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন যে রাজা রুদ্রনারায়ণের নিকট হইতে একজন দূত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

দীননাথ প্রতিহারীর মুখে এই সংবাদ শুনিবামাত্র শশব্যস্তে বহির্ব্বাটীতে আগমন করিয়া দূতের সাদরসম্ভাষণ করিলেন এবং রাজার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ অবগত হইতে সমুৎসুক হইলেন।

দূত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন "হে বঙ্গবীরচূড়ামণি! রাজার চিন্তাক্লিষ্ট বদন-মণ্ডল দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি অনুমান করিতেছি, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন কার্য্যের জন্য তিনি আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন। কারণ তিনি শিবমন্দিরে উপস্থিত

হইয়াই আমাকে এই বলিয়া আপনার নিকট পাঠাইলেন যে আপনি যতশীঘ্র সম্ভব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন। এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন।" এই বলিয়া দূত তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

বীরপুঙ্গব দীননাথ দূতমুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সসম্মানে বলিলেন, "আপনি অবিলম্বে রাজসকাশে গমন করিয়া তাঁহাকে জ্ঞাপন করুন যে, অধীন দীননাথ যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে নৃপাদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিবে।"

অনন্তর দীননাথ দূতকে বিদায় দিয়া সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিলেন এবং রণবেশে সজ্জিত হইয়া দুই জন শরীররক্ষক অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে কাটশাকড়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই দীননাথ রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন।

রাজা সসম্ভ্রমে দীননাথের হস্তধারণপূর্ব্বক স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহাকে উপবিষ্ট করাইলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া যথেষ্ট আপ্যায়িত করিলেন। রাজা সুখবর্ত্তীয় নানা-প্রকার কথাবার্ত্তার পর রাজা দীননাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বীরশ্রেষ্ঠ! অদ্য এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া আমি অতি

কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি এবং সেই কৌতুহলনিবারণের জন্যই আমি আপনাকে আহ্বান করিয়াছি।"

রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া দীননাথ সবিনয়ে বলিলেন, "কি দৃশ্য দেখিয়া আপনি এত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছেন, দয়া করিয়া আমার নিকট তাহা বর্ণনা করুন; আমি যথাসাধ্য আপনার কৌতুহল নিবারণের চেষ্টা করিব।"

রাজা বলিতে লাগিলেন, "অদ্য অপরাহ্নে আমি যখন নৌকাযোগে কাটশাকড়া অভিমুখে আসিতেছিলাম, তখন কিয়দ্দূর হইতে দেখিতে পাইলাম কুলাকাশের নিকটবর্ত্তী নদিতটে এক বীরাঙ্গনা, রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া বর্শাপ্রহারে এক বিপুলকায় ভীষণ বন্যমহিষ বধ করিতেছে। এই অভিনব দৃশ্যে বিমুগ্ধ হইয়া সেইদিকে দ্রুতবেগে নৌকা চালাইতে বলিলাম; নৌকা সেইস্থানের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, আমি লম্ফপ্রদান করিয়া তটে অবতরণ করিলাম এবং রমণীর নিকটে গমন করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। রমণী সলজ্জভাবে দুই একটী কথায়, আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া অশ্বে কশাঘাত করিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনার কন্যাই কি অস্ত্রশস্ত্রপ্রয়োগে এরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছে?"

দীননাথ বিনীতভাবে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন রমণী

আপনার প্রশ্নের উত্তরে কি আত্মপরিচয় দিল শুনিলে বুঝিতে পারি, সে আমার কন্যা কি না?

রাজা বলিলেন, "রমণী, আপনার কন্যা বলিয়াই পরিচয় দিয়াছে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনার কন্যা যুদ্ধবিদ্যায় এতাদৃশ দক্ষতা লাভ করিল কি প্রকারে? এবং এই যুবতী কন্যাকে শ্বশুরালয়ে না রাখিয়া নিজের বাটীতেই বা রাখিয়াছেন কেন?"

দীননাথ বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! একটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া আমার পত্নী ইহলোক ত্যাগ করেন। স্ত্রীবিয়োগসময়ে পুত্রটী অত্যন্ত শিশু ছিল, সুতরাং তাহার লালনপালনের ভার ধাত্রীর হস্তেই অর্পণ করি; কিন্তু সেই সময়ে কন্যাটীর জ্ঞানোদয় হইয়াছিল। মাতৃবিয়োগের পর হইতে সে আমার এত ঘনিষ্ট হইয়া পড়িল যে তিলেকের জন্যও আমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। কাজেই, আমি যেখানে যাইতাম সেইখানেই তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া লইয়া যাইতাম। এইরূপে কন্যা অশ্বারোহণে পটুতা লাভ করিল। আমি যখন সৈন্যগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইতাম, তখন কন্যাও অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করিত; অল্পবয়সে তাহার অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগে নিপুণতা দেখিয়া আমি অতি যত্নসহকারে তাহাকে যুদ্ধবিদ্যায় যথাশক্তি শিক্ষা দিয়াছি এবং উপযুক্ত শিক্ষ-

কের সাহায্যে তাহাকে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি ও গণিতবিদ্যায় সুশিক্ষা দান করিয়াছি। মহারাজ! উপযুক্ত পাত্রের অভাবে আমি কন্যার এ পর্য্যন্ত বিবাহ দিই নাই এবং আমার কন্যাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি যদি তাহাকে অসি-চালনায় পরাস্ত করিতে পারে তবে সেই ব্যক্তিকেই সে পতিত্বে বরণ করিবে, নচেৎ আজীবন কুমারী থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণবংশে এরূপ পাত্র পাওয়া সুদুর্লভ, সেই জন্য যুবতী কন্যাকে কুমারী অবস্থায় নিজগৃহে রাখিতে বাধ্য হইয়াছি।

রাজা, দীননাথের এই কথা শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "যুবতী কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় গৃহে রাখা শাস্ত্র-বিগর্হিত।"

রাজার এই বাক্যে দীননাথ উত্তর করিলেন, "কেন মহারাজ! মনু ত বলিয়া গিয়াছেন যে, কন্যার বিবাহকাল উত্তীর্ণ হইলেও অনুপযুক্ত পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এতদ্ভিন্ন কন্যা নিজেই সাধারণ পুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে একেবারেই অস্বীকৃতা। এরূপ অবস্থায় তাহার বিবাহ না দেওয়া কিরূপে শাস্ত্র-বিগর্হিত হইতে পারে?"

এই কথা শুনিয়া রাজা সস্মিতমুখে বলিলেন, "ইহাতে

আপনার কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না বটে। আমি আপনার কন্যার উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিতেছি। শীঘ্রই আপনি সংবাদ পাইবেন। এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, আপনি গৃহে গমন করিতে পারেন। অনন্তর দীননাথ রাজাকে যথোচিত অভিবাদন করিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে রাজার পাত্র অন্বেষণের কথা লইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ভবশঙ্করীর সহিত রাজা রুদ্রনারায়ণের বিবাহের প্রস্তাব।

রাজা রুদ্রনারায়ণ ভবানীপুরে প্রত্যাগত হইয়া বিদ্যা-বতী বীরাঙ্গনা ভবশঙ্করীকেই পরিণয়ের উপযুক্তা পাত্রী বিবেচনা করিলেন। কিন্তু তেজস্বিনী রমণী তাঁহাকে স্বামী-রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবে কি না তদ্বিষয়ে নানাচিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার শরীরে যৌবনোচিত যথেষ্ট শক্তি থাকিলেও তাঁহার বয়স অধিক হইয়াছে এবং রাজা হইয়া একজন সর্দ্দারের কন্যার সহিত অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াও অত্যন্ত অপমানের কথা। মহাশক্তিশালিনী রণরঙ্গিনী যুবতী সামান্যা নারী নহে। ইহার সহিত

যুদ্ধে পরাস্ত হইলে আর লজ্জার সীমা থাকিবে না। কিন্তু যুবতী পণ করিয়াছে, যে ব্যক্তি তাহাকে অসিযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিবে সে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবে। এরূপ অবস্থায় কি প্রকারে বিবাহের প্রস্তাব করা যাইতে পারে?

রাজা এবংবিধ নানাচিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া দীক্ষাদাতা গুরু হরিদেব ভট্টাচার্য্যের নিকট এই সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলেন।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য সর্ব্বজন-সম্মানিত হরিদেব রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন. "তোমার এ বিষয়ে চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি স্বয়ং দীননাথ ও তাঁহার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাহাতে তাঁহারা এই বিবাহে সম্মত হন তদ্বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। তোমায় দীননাথের কন্যার সহিত অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে না।"

গুরুদেব রাজাকে এই সমস্ত কথায় আশান্বিত করিয়া এক দিবস দীননাথের ভবনে গমন করিলেন। দীননাথ রাজগুরু বশিষ্টকল্প হরিদেবকে স্বীয় ভবনে আগত দেখিয়া ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং পাদ্যার্ঘ্য দিয়া তাঁহার পূজা করণান্তে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

হরিদেব দীননাথকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে বীরকুলকেশরি! আমি শুনিয়াছি তোমার একটী পরমরূপলাবণ্যবতী, অশেষগুণশালিনী, যুদ্ধবিদ্যা-পারদর্শিনী অনূঢ়া কন্যা আছে। কন্যার বিবাহকাল অতীত হইলেও উপযুক্তপাত্রাভাবে তাহার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার নাই। আমার এক্ষণে বক্তব্য এই যে, তোমার মহাশক্তিশালিনী কন্যা রূপে ও গুণে অদ্বিতীয়া এবং কোন পরাক্রান্ত রাজার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবার উপযুক্তা। আমাদের রাজা রুদ্রনারায়ণও এক মহাপুরুষের আদেশক্রমে পুত্রলাভেচ্ছায় দ্বিতীয় দার পরিগ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। অতএব এই আশাতীত সুযোগ পরিত্যাগ করা কিছুতেই তোমার কর্ত্তব্য নহে। আর, আমি অবগত হইয়াছি যে রাজা স্বয়ং তোমার রূপবতী কন্যার সৌন্দর্য্য ও শৌর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন, এবং তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক আছেন। এক্ষণে এই বিবাহ-কার্য্যে তোমার মত জিজ্ঞাসা করি।"

এই কথা শুনিয়া দীননাথ উত্তর করিলেন, "মহারাজ রুদ্রনারাণ যদি এ অধীনের কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তদপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমার কন্যার ভাগ্যে যে এরূপ সুখোদয় হইবে, তাহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। এ বিবাহে

আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ও সম্মতি আছে। কিন্তু কন্যা আমার সাবালিকা ও নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা। আমি তাহাকে আপনার সম্মুখে আনাইতেছি, দয়া করিয়া আপনি একবার এই বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মত জিজ্ঞাসা করুন।" এই বলিয়া দীননাথ কন্যা ভবশঙ্করীকে রাজগুরু হরিদেবের সম্মুখে আনয়ন করিলেন।

ভবশঙ্করী ধীরপদবিক্ষেপে পণ্ডিতাগ্রগণ্য বর্ষীয়ান্ গুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণ-যুগল অর্চনা করিলেন।

হরিদেব কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা, তুমি বহুগুণে বিভূষিতা হইয়া রমণীগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছ। আশা করি, তোমার দ্বারা বঙ্গ-দেশের মহোপকার সাধিত হইবে। রাজা রুদ্রনারায়ণ পুত্রার্থে দ্বিতীয়বার দারগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছেন। তুমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়া আমাদের আশা পূর্ণ কর।"

ভবশঙ্করী ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রীড়াবিনম্র-বদনে বলিলেন, "মহাত্মন্! আপনার বাক্য আমার সর্ব্বথা শিরোধার্য্য হইলেও পিণাকপাণির আরাধনা করিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে ব্যক্তি অসিযুদ্ধে আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে, সেই বীর্য্যবান্ পুরুষসিংহকে আমি পতিত্বে বরণ করিব।"

ভবশঙ্করীর এই কথার উত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা! রাজা রুদ্রনারায়ণের বীরত্ব ও রণদক্ষতা তোমার পিতার অবিদিত নাই। বোধ হয়, বঙ্গদেশে এমন কোন বীর পুরুষ নাই, যিনি অসিযুদ্ধে রাজা রুদ্রনারায়ণকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়েন। তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কি তাঁহার পক্ষে অপমানজনক নহে? তোমার প্রতিজ্ঞার অর্থ এই যে অধিকতর বীর্য্যবান্ ও রণকুশল ব্যক্তিকে তুমি স্বামীরূপে গ্রহণ করিবে। রাজা রুদ্রনারায়ণ যে বীর্য্যে ও রণদক্ষতায় তোমা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। আমার স্মরণ আছে, বহুকালপূর্ব্বে রাজবাটীতে সমরকৌশল প্রদর্শনের জন্য বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বীরগণ আমন্ত্রিত হয়েন। সেই সময়ে সমস্ত বীরগণ, এমন কি তোমার পিতা পর্য্যন্তও রাজা রুদ্রনারায়ণের সহিত অসিযুদ্ধে পরাস্ত হয়েন। তোমার পিতা উপস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পার।"

রাজগুরু হরিদেবের কথা শুনিয়া ভবশঙ্করী বলিলেন, "দেব! আপনার বাক্যে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের রাজা যে সমরনৈপুণ্যে বঙ্গদেশে অদ্বিতীয় তাহার অনেক প্রমাণ আছে। যাহা হউক, বিবাহের পূর্ব্বে রাজবল্লহাটের রাজবল্লভী দেবীর পূজাকালে বলিদানের জন্য

দুইস্থানে পাশাপাশি দুইটা করিয়া মহিষ ও তন্নিম্নে একটী করিয়া মেষ স্থাপিন করা হউক। খড়্গের এক আঘাতে রাজাও একদল পশুকে বধ করিবেন, আমিও অন্যদল পশুকে বধ করিব। এই কার্য্যে তাঁহাকে আমার সহিত অসিধারণ করিতে হইবে না এবং আমিও মহাশক্তির নিকট রাজার শক্তির পরিচয় লইয়া দেবীর সম্মুখেই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিব এবং আমার পণও রক্ষা হইবে।" এই কথা বলিয়া বীর্য্যবতী বালা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

রাজবল্লভীদেবীর মন্দির ও মহিষ বলিদান।

এক শুভদিনে রাজবল্লভীদেবীর পূজার বিশেষরূপ আয়োজন হইল। আগমাচার্য্য রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্য্য দেবীর পূজায় স্বয়ং ব্রতী হইলেন। সেনাপতিগণ নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। সুবিস্তৃত মন্দিরপ্রাঙ্গণ ও নাট্যমন্দির পূজাদর্শনার্থী নরনারীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। রাজা রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া দেবীর সম্মুখে বীরাসনে যুক্তকরে উপবিষ্ট আছেন। সুললিত মন্ত্রধ্বনিতে সেইস্থান যেন এক অপূর্ব্ব দিব্যভাবে পূর্ণ হইয়া

৺রাজবল্লভী দেবী।

উঠিয়াছে। ধূপ-ধুনা ও পুষ্পের সৌরভে মন্দিরতল আমোদিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, ঝাঁঝর, দামামা, ভেরী, তুরী ও ঢক্কার গুরুগম্ভীর নিনাদে সমস্ত নগর আনন্দময় হইয়া উঠিতেছে।

প্রায় মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময়ে পূজক ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"বলিদানের সময় উপস্থিত; পশুগণকে পুষ্করিণী হইতে স্নান করাইয়া আন।"

এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র দশ বারজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি পশুগণকে স্নান করাইতে লইয়া গেল; জনতার মধ্যে একটা অস্ফুট কলকলধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। প্রহরীগণ শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে লাগিল। স্নানান্তে পশুগণকে আনিয়া দেবীর সম্মুখে প্রাঙ্গনতলে একস্থানে দুইটী মহিষকে পাশাপাশি অবদ্ধ করা হইল এবং মহিষ দুইটীর নিম্নে একটী মেষ স্থাপিত হইল; একটু অন্তরে ঐরূপ আর একদল পশুও সজ্জিত হইল।

পূজক উদকপূর্ণ কোশা হস্তে লইয়া পশুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে পূজা করণান্তর দেবীকে নিবেদন করিয়া দিলেন। তৎপরে রাজার নিকট গমন করিয়া পূজিত ও সিন্দুরাঙ্কিত খড়্গ তাঁহার হস্তে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা গলবস্ত্র হইয়া তাঁহার পদতলে প্রণত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—

"গুরুদেব! বীরবালা ভবশঙ্করী তাঁহার প্রতিজ্ঞামত এখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই, তবে আমার স্বহস্তে পশুবধ করিবার আবশ্যকতা কি?"

গুরুদেব সস্নেহবচনে কহিলেন,—"বৎস! চিন্তিত হইও না; বীরাঙ্গনা এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবেন।"

ক্ষণপরেই দূরে দ্রুতগামী অশ্বের ক্ষুরধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। সকলেরই দৃষ্টি তোরণদ্বারের দিকে আকৃষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে এক সুন্দরী রমণী সুবৃহৎ শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। তাহার দক্ষিণ হস্তে উলঙ্গ কৃপাণ সূর্য্যাকরে ঝলসিতে লাগিল; তাহার সুদৃঢ় মনোহর বপু রক্তবস্ত্রে সুশোভিত; সুন্দর ললাটতল সিন্দূরবিন্দু দ্বারা উদ্ভাসিত। সুচিক্কণ বেণী কৃষ্ণসর্পের ন্যায় পৃষ্ঠদেশে দোদুল্যমান; ঘোর লালবর্ণ জবাফুলের মালা তাঁহার গলদেশে প্রলম্বিত। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন শিব-হৃদয়-নিবাসিনী মহাশক্তি মূর্ত্তিধারণ করিয়া পৃথিবীর পাপ, তাপ, অত্যাচার বিনাশ করিবার জন্য আজ এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন। এই রুদ্ররূপিণী বীর্য্যবতী রমণীকে দেখিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইল।

বীরাঙ্গনা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং দেবীকে প্রণাম করিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণবর্গ

ও রাজার নিকট প্রণতা হইলেন। রাজগুরু হরিদেব রমণীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার অসি দেবীর সম্মুখে লইয়া গিয়া পূজা করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, বলিদানের সময় উপস্থিত; উপস্থিত জনগণ সকলেই তারস্বরে মহামায়ার জয় ঘোষণা করুন—গুরুদেবের মুখ হইতে এই বাক্য নিঃসৃত হইতে না হইতে রাজা রুদ্রনারায়ণ ও বীরাঙ্গণা ভবশঙ্করী অসি-হস্তে নিজ নিজ স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। 'জয় মা' শব্দে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। সকলেই সোৎসুকনেত্রে রাজার ও বীরা নারীর দিকে চাহিল। দুইটী অসি যুগপৎ উত্থিত হইল এবং অসি পতনের সঙ্গে সঙ্গেই চারিটি মহিষমুণ্ড ও দুইটী মেষমুণ্ড ভূলুণ্ঠিত হইল।

রমণী তৎক্ষণাৎ বলির রক্ত লইয়া রাজার ললাটে ফোঁটা দিলেন এবং স্বীয় গলদেশ হইতে জবার মালা লইয়া রাজার গলায় পরাইয়া দিলেন। তৎপরে দেবীকে প্রণাম করিয়া বিদ্যুৎবেগে অশ্বে আরোহণ করিয়া কশাঘাত করিলেন। অশ্ব বিকট হ্রেষারব করিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিল। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে বীরাঙ্গনা দৃষ্টির বহির্ভূতা হইলেন।

সকলেই অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারও

মুখে কোন কথা নাই। সকলেই চিত্রার্পিত মূর্ত্তির ন্যায় স্থির। সমস্তমন্দিরপ্রাঙ্গণ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। বাতাস পর্য্যন্ত যেন গতিহীন। সকলেই মনে করিতে লাগিল এই যে ব্যাপার সংঘটিত হইল, ইহা সত্য না স্বপ্ন।

রাজা রুদ্রনারায়ণের সহিত ভবশঙ্করীর বিবাহ ও রাজ্যের উন্নতি-কল্পে বিবিধ চেষ্টা।

শুভদিনে, শুভক্ষণে রাজা রুদ্রনারায়ণ ভবশঙ্করীর পাণি-গ্রহণ করিলেন। রাণী ভবশঙ্করীর জন্য গড়ের বাহিরে দামোদরতীরে এক প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। নবপরিণীতা রাণী সেই প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাজ-কার্য্যেই তিনি রাজাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশেষতঃ সৈন্যগণ যাহাতে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত হয় তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগিনী হইলেন। অনেক সময় তিনি সৈন্যগণের শিক্ষাকার্য্য স্বয়ং পরিদর্শন করিতেন, এবং রাজ্যমধ্যস্থ ব্রাহ্মণেতর সমস্ত সমর্থ ব্যক্তিকেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। রাজ্যের স্থানে স্থানে তিনি দুর্গ নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। তারকেশ্বরের নিকট-বর্ত্তী ছাউনাপুর গ্রামে এখনও একটী ভূমধ্যস্থ দুর্গের

নপাড়া— সরাই-মনসার মন্দির।

ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই গ্রামে সৈন্যগণের 'ছাউনী' ছিল বলিয়াই ইহার নাম ছাউনাপুর হইয়াছে। এই ছাউনাপুরদুর্গপরিখার বহির্দ্দেশে রাণীর প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রাহ্মণরাজগণ দেবসেবা নির্ব্বাহের জন্য বহু ভূ-সম্পত্তি দান করেন। তেঘরা নিবাসী এক ব্রাহ্মণ এই রাজদত্ত ভূসম্পত্তির আয়ে এখনও দেবসেবা চালাইয়া আসিতেছেন। হুগলী জেলার বাশুড়ী গ্রামে রাণী ভবশঙ্করী ভবানী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। হাওড়া শিবপুর নিবাসী ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীযুক্ত রাখালকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ভবানী দেবীর মন্দির ও ব্রাহ্মণরাজবংশপ্রতিষ্ঠিত সরাইমনসা দেবীর মন্দির বহুব্যয়ে সংস্কৃত করিয়া প্রাচীনকীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন এবং ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা ও সম্মানভাজন হইয়াছেন। রাণী প্রজাগণের উন্নতিসাধনকল্পে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতেন। তিনি অশ্বারোহণে গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিয়া প্রজাগণের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিতেন। তাঁহার সময়ে দুঃখ, দৈন্য ও রোগ,শোক রাজ্য হইতে বিদূরিত হইয়াছিল। কৃষি, বস্ত্রবয়ন ও ধাতুপাত্রাদিনির্ম্মাণশিল্পে প্রজাগণ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষি ও বস্ত্রবয়নশিল্পের জন্য ভুরস্যুট্ এখনও দেশপ্রসিদ্ধ। হাওড়ায় প্রতি মঙ্গলবারে যে কাপড়ের হাট বসে তাহার অধিকাংশ কাপড় এই

ভুর্‌স্নুটে এখনও উৎপন্ন হয়। রাজ্যের মঙ্গলসাধনে প্রাণপাতচেষ্টা করিতেন বলিয়া রাণী ভবশঙ্করীকে সমস্ত প্রজাগণ জগদ্ধাত্রীজ্ঞানে পূজা করিত। তাঁহার মহা-শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া সমস্ত ভূরিশ্রেষ্ঠপুর সজীবতাপূর্ণ, প্রফুল্লতাময় আনন্দরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। সেই ভুরস্নুট্‌ এখনও আছে কিন্তু আর সে সজীবতা নাই, আর সে প্রফুল্লতা নাই; সকলই নির্জীব, সকলই নিরানন্দ।

রাজা রুদ্রনারায়ণের পুত্রলাভ ও মৃত্যু।

বিবাহের দুই এক বৎসর পরেই রাণী ভবশঙ্করীর গর্ভে রাজা রুদ্রনারায়ণের একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্র লাভ করিয়া রাজা বংশরক্ষা হইল ভাবিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, ব্রাহ্মণগণকে অকাতরে ভূমি ও সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন। রাজ্যে মহামহোৎসব হইতে লাগিল। প্রকৃতিবর্গও প্রজাবৎসল রাজার বংশধর জন্ম গ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া মহোল্লাসে উৎফুল্ল হইল এবং নিজ নিজ সাধ্যানুসারে আনন্দোৎসব করিতে লাগিল।

রাণী ভবশঙ্করীর এই পুত্রই ভবিষ্যতে রাজা প্রতাপ

নারায়ণ নামে বিখ্যাত হয়েন। ভুরস্যুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশের ইতিহাসে প্রতাপনারায়ণের বিষয় সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। কোন্ সময়ে দানবীর, প্রজারঞ্জক, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য রাজা প্রতাপ নারায়ণ ভুরস্যুটে মহাপরাক্রমের সহিত রাজ্য করিতেন তাহা অনাদিমঙ্গল নামক কাব্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত পদ্যাংশ পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

হুগলী জেলার মহকুমা আরামবাগের নিকটবর্ত্তী হায়াৎপুর গ্রামে রঘুনন্দন আদক নামক এক ধনাঢ্য মাহিষ্য বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র রামদাস আদক 'অনাদিমঙ্গল' নামক একখানি পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। রাজা প্রতাপনারায়ণের প্রায় অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রামদাস আদক হায়াৎপুর গ্রামের 'যাত্রাসিদ্ধি' নামক ধর্ম্মঠাকুরের নিকট এই 'অনাদিমঙ্গল' কাব্য ১৫৮৪ শকের অর্থাৎ ১৬৬২ খৃঃ অব্দের ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ অষ্টমীতে প্রথম গান করেন। তিনি তাঁহার কাব্যে রাজা প্রতাপ নারায়ণের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভুরস্যুটে রাজা রায় প্রতাপ নারায়ণ।
দানদাতা কল্পতরু কর্ণের সমান॥
তাঁহার রাজ্যেতে বাস বহুদিন হোতে।
পুরুষে পুরুষে চাষ চষি বিধিমতে॥
যাত্রাসিদ্ধি বন্দিলাম গ্রাম হায়াৎপুরে।

প্রথম প্রচার গীত যাঁহার দুয়ারে ॥
তিন বান বসু বেদ শকে সুপ্রচার।
ভাদ্র আদ্য কৃষ্ণপক্ষে অষ্ট দিবস তাহার ॥"

এই কুলপাবন নন্দন প্রতাপনারায়ণ জন্মাইবার কিছুদিন পরেই রাজা রুদ্রনারায়ণ ইহলীলা সম্বরণ করেন। তৎকালে মহানুভব সম্রাট্ আকৃবর সাহ দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন এবং পাঠানগণ বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইলেও পাঠানসর্দ্দারগণ উড়িষ্যা হইতে আসিয়া মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশে অত্যাচার করিত। এই সময়ে দক্ষিণপশ্চিমবঙ্গের হিন্দুনরপতিগণ সকলেই প্রায় বাদ্সাহ আকৃবর সাহের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু পাঠানসর্দ্দারগণ তাঁহাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার জন্য ভয়, ভক্তি প্রদর্শন করিতে এমন কি অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর রাণীর শোক। ও গুরুদেবের উপদেশ।

রাজা রুদ্রনারায়ণ কালগ্রাসে পতিত হইলে, রাণী

ভবশঙ্করী অসহনীয় শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সমস্ত বীরত্ব ও ধীরত্ব লুপ্ত হইল, তিনি সহমৃতা হইতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। এই সঙ্কল্প ত্যাগ করাইবার জন্য অনেকই তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই তিনি প্রবোধ মানিলেন না। এমন কি অভিভাবকহীন শিশুসন্তানের প্রতি মমতাও তাঁহার এই প্রবল শোকতরঙ্গে ভাসিয়া গেল।

অবশেষে গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণী গুরুদেবকে দেখিবামাত্র অতিরিক্ত শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ছিন্নমূলতরুর ন্যায় তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। রাজপরিবারস্থ সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহারা মনে করিল বুঝি রাণীও তাহাদের ছাড়িয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। গুরুদেব তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া স্থির হইতে বলিলেন এবং অবিলম্বে সুশীতল বারি আনিতে অনুমতি করিলেন। রাণীর অনুচরিগণ বাষ্পাকুলনেত্রে ব্যজন করিতে লাগিল এবং গুরুদেব নিজ-হস্তে রাণীর মুখমণ্ডলে বারিসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপে অতীত হইলে রাণী সংজ্ঞা লাভ করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং সম্মুখে গুরুদেবকে দেখিয়া তাঁহার আকর্ণবিশ্রান্তনয়নযুগল হইতে দরবিগলিতধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

গুরুদেব রাণীর হস্ত ধরিয়া তুলিয়া বসাইলেন এবং নিজউত্তরীয়বস্ত্রে তাঁহার চক্ষুজল মুছাইয়া স্নেহপূর্ণ কোমলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "মা! তুমি সামান্যা রমণী নহ। তুমি মহাশক্তিরূপিণী বীরবালা। রাজার স্বর্গারোহণে প্রজাগণ নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার মুখপানে চাহিয়া আছে। তোমাকে তাহারা জগদ্ধাত্রী বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। মা! তুমি এই অসংখ্য প্রজার মুখের দিকে চাহিয়া শোক সম্বরণ কর। মূঢ়গণই শোকে বিমুগ্ধ হয়; তোমার ন্যায় মহীয়সী রমণীর এতদূর কাতর হওয়া উচিত নহে। মা! আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি ভিন্ন এই সুবিস্তৃত রাজ্য শাসন করিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তোমার পুত্র অতিশিশু, এই শৈশবাবস্থায় সে পিতৃহীন হইল। এখন তুমিই তাহার পিতৃস্থানীয়া; তাহার সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার জন্য তোমাকেই প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। আর এখন বঙ্গদেশের অবস্থা যেরূপ ঘোরসঙ্কটাপন্ন তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে সুদৃঢ়হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার ন্যস্ত না হইলে রাজ্যের মহা অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। অতএব মা! সকল দিক চিন্তা করিয়া ধৈর্য্য ধারণ কর।

রাণী কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অশ্রুভারাক্রান্তনেত্রে গদ্গদ্কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, দেব! আপনি আমায় এরূপ আজ্ঞা করিতেছেন কেন? স্বামীই নারীর

একমাত্র গতি ; পতিই রমণীহৃদয়গগণে সূর্য্যস্বরূপ বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার সমস্ত দুঃখান্ধকার বিদূরিত করিতে সমর্থ ; স্ত্রীলোকের পতিই ধর্ম্ম, পতিই কর্ম্ম, পতিই একমাত্র উপাস্য দেবতা। স্বামীর কার্য্য ভিন্ন নারীর অন্য কোন কার্য্য নাই ; এক কথায় স্বামী ভিন্ন পতিব্রতা স্ত্রীর পৃথক অস্তিত্বই থাকিতে পারে না।

গুরুদেব ! জীবনসর্ব্বস্বস্বামীবিরহে কিরূপে জীবন ধারণ করিব ? আজ্ঞা করুন, তাঁহারই সেবায় অর্পিত আমার এই অকিঞ্চিৎকর দেহ তাঁহার চিতানলে ভস্মীভূত করিয়া হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় জ্বালা প্রশমিত করি। দেব ! এ দেহ জ্বলিয়া না যাইলে প্রাণের জ্বালা মিটিবে না। তিনি অমরধামে একাকী প্রস্থান করিয়াছেন। আমি যে তাঁহার চিরসঙ্গিনী ; আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া এই মরলোকে অবস্থান করিব।

বিবাহের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত শয়নে, স্বপনে ভোজনে, জাগরণে, গৃহে, অরণ্যে, সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে, যুদ্ধস্থলে, শত্রুমধ্যে সর্ব্বদাই যে আমি ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতাম। এখন তিনি চলিয়া গেলেন, আমি না যাইয়া থাকিব কিরূপে ! তাঁহার দেহ বৈশ্বানর ভস্মীভূত করিবে, আমার দেহ করিবে না কেন ! তাঁহার আত্মার যে গতি, আমার আত্মারও সেই গতি; তাঁহার দেহের

যে পরিণতি আমার দেহেরও সেই পরিণতি। গুরুদেব! আমার সঙ্কল্পিত কার্য্যে আর আপনি বাধা দিবেন না। এই কথা বলিয়া রাণী অবনতমস্তকে উপবিষ্টা রহিলেন।

গুরুদেব রাণীর বচনে কাতর হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "মা! তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা; তোমাকে বুঝাইবার আর কিছুই নাই। তুমি যাহা বলিলে পতিব্রতা নারীর তাহাই ধর্ম্ম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু মা! একটু ধৈর্য্যধারণ করিয়া ভাবিয়া দেখ; তোমার পুত্র অতি শিশু। তোমার স্বামীর মস্তকে যে গুরুতর রাজ্যভার ন্যস্ত ছিল, সেই রাজ্যভার তিনি এখন কাহার হস্তে অর্পণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন! এই শিশুসন্তানের লালন পালন ও শিক্ষার ভার কাহার স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন? এই শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যতদিন না রাজ্যভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, ততদিন এই শিশুর অভিভাবক স্বরূপ তোমাকেই রাজ্যরক্ষা করিতে হইবে। ইহা না করিলে তোমাকে অধর্ম্মে পতিত হইতে হয়। তুমি এই মাত্র বলিয়াছ, স্বামীর কার্য্যই তোমার কার্য্য। শিশুপুত্রের লালন, পালন ও শিক্ষা তোমার স্বামীর অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু এই কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তিনি ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে

ভুরীশ্রেষ্ঠ রাজ্যের ব্রাহ্মণ নৃপতিগণের বংশাবলী।

* ইনি রাজা চতুরানন নিয়োগীর কন্যাকে বিবাহ করেন।

† ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
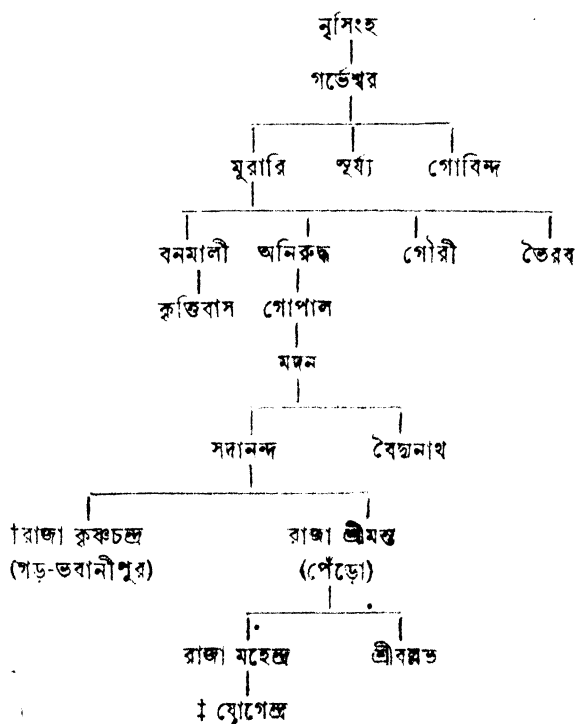
যোগেন্দ্র
অমরেন্দ্র
সুরেন্দ্র
গোপীচরণ
রাজীব
(কালাপাহাড়)
রাজা ভূপতি
শ্যাম
প্রাণবল্লভ
জগজ্জীবন
রাজা সদাশিব
চাঁদ
রাজবল্লভ
রাজা নরেন্দ্র
বংশীধর
কাশীশ্বর
রসিকলাল
শুকদেব
চতুর্ভুজ
অর্জ্জুন
দয়ারাম
ভারতচন্দ্র (মৃত্যু ১৭৬০ খৃঃ অঃ)
ভাগবত
তারক
রামধন
অমরনাথ
পূর্ণচন্দ্র
গোবিন্দ
অমূল্য
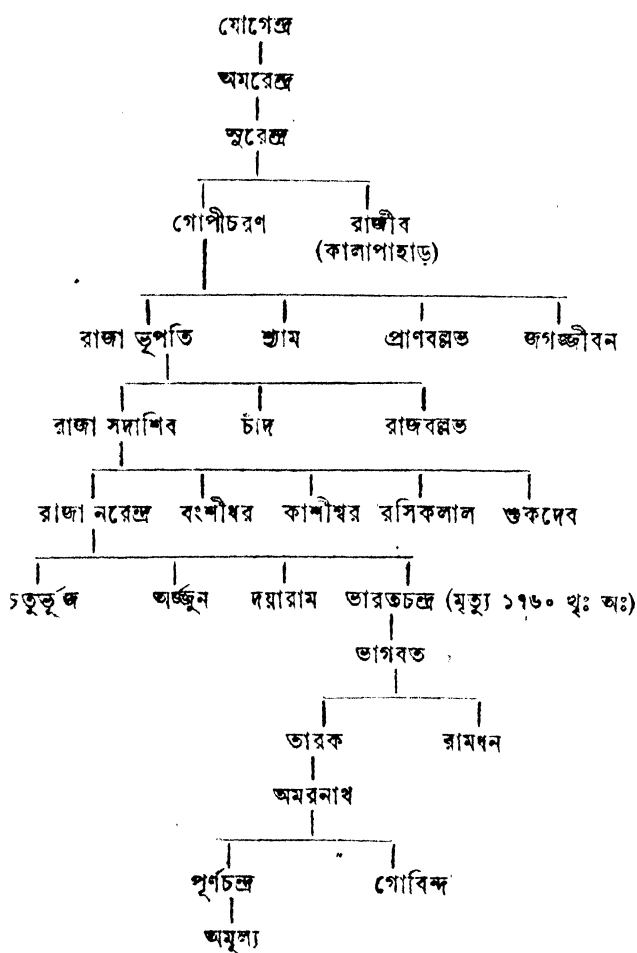
- রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (গড়-ভবানীপুর রাজবংশ।)
  - দেবনারায়ণ (১৩০৬ শক—১৩৮৪ খৃঃ অঃ)
    - রাজা দর্পনারাণ
      - রাজা উদয়নারাণ
        - সত্যনারাণ
          - শিবনারাণ
            - রাজা রুদ্রনারায়ণ পত্নী রাণী ভবশঙ্করী (রায়বাঘিনী)
              - রাজা প্রতাপনারায়ণ
                - রাজা নরনারায়ণ
                  - রাজা লছমীনারায়ণ (ইহার আমলে রাজত্ব পরহস্তগত হয়)
                    - রূপনারায়ণ রায়
                      - শ্রীনারায়ণ
                      - মদন
                      - চণ্ডী
                        - অম্বিকা
                          - সারদা
                          - শশী
                          - হরি
                          - ঋষি
                      - শম্ভু
      - অভিরাম
        - চন্দ্রশেখর
          - মহাদেব
            - হরিদেব
              - বৈদ্যনাথ
                - ঠাকুরদাস
                  - সূর্য্য
                  - চন্দ্র
                    - নগেন
                      - সনৎ
                  - কালী
                    - *অতুল
                    - ইন্দ্রপদ
                  - জগৎ
                    - জানকী
                    - মহিম
                    - অনিল
        - সাহেব রায়
          - হরিনারাণ
            - লক্ষ্মীকান্ত
              - মাণিক
                - তারিণী
                  - হেম
                  - শরৎ
                  - সারদা
                  - চুণী
            - মৃত্যুঞ্জয়
              - কানাই
                - পরাণ
                  - প্রবোধ
              - রাম
                - কৃষ্ণ
                  - গোবিন্দ
      - বিধি
      - গোবিন্দ
    - মুকুটরাম
    - ভবানী
    - দুর্গাদাস
    - বসন্ত
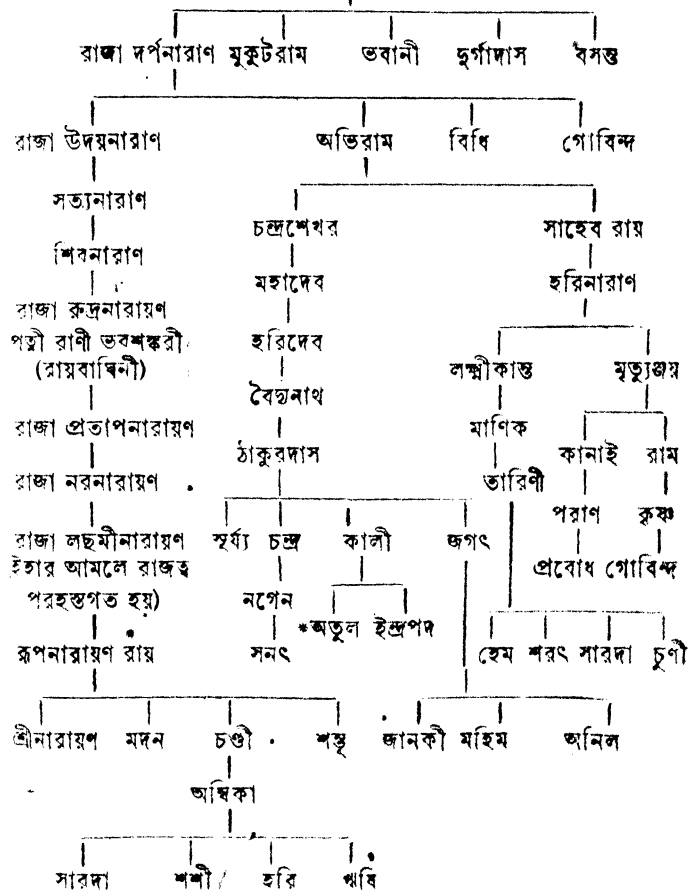
* ইনি বাঁকিপুর হাইকোর্টের উকিল।

তাঁহার অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পন্ন করা নিশ্চয়ই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মসঙ্গত।

আরও ভাবিয়া দেখ তোমার স্বামীর নশ্বরদেহমাত্র ধ্বংস হইয়াছে। আত্মা অবিনশ্বর। দেহ, তিনি নহেন; আত্মাই তিনি, কেবলমাত্র এই দেহ রূপ গৃহে বাস করিতেছিলেন। তোমার আত্মা যদি তাঁহার আত্মার সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেত তুমি তাঁহার অভাব বুঝিতে পারিবে না। ধ্বংসশীল দেহের জন্য শোক প্রকাশ উচিত নহে। তাঁহার আত্মা তোমার আত্মার সহিত মিলিত হইয়া তোমার দেহেই কার্য্য করুক।

এই পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্ম করিবার জন্যই আত্মা দেহ ধারণ করেন। ভগবৎ ইচ্ছায় যখন তোমার দেহ আপনা আপনি ধ্বংস হইবে তখন তোমার আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। দেহাত্মবুদ্ধি হইয়া তোমার নিজ ইচ্ছানুসারে দেহ ধ্বংস করিবার কোন অধিকার নাই। অতএব ধৈর্য্য ধারণ কর। শোকপ্রকাশ করিবার কারণ অতি অকিঞ্চিৎকর। স্বার্থজ্ঞানশূন্য হইয়া জগতের হিতার্থে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। শিশুপুত্রকে লালন পালন কর। রাজপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যাহাতে সে রাজ্যভারগ্রহণে সমর্থ হয় তাহাকে তদনুরূপ শিক্ষা প্রদান কর।

রাজা রুদ্রনারায়ণ মোগলপক্ষ অবলম্বন করায় পাঠানগণ

তাঁহার উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট ছিল। এখন তাঁহার মৃত্যুতে যদি তাহারা রাজকার্য্যে তোমার ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে, তবে নিশ্চয় জানিও এ রাজ্য শীঘ্রই পাঠানকবলিত হইবে।

আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি ভগবান্ যে তোমায় এরূপ শক্তিশালিনী ও রণনিপুণা করিয়াছেন, এ রাজ্য শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। দ্বিগুণ উৎসাহ ও দ্বিগুণ শক্তির সহিত তুমি রাজকার্য্য পরিচালনা কর। নিশ্চয় জানিও, পাঠানগণ এই অবসর কখনও ত্যাগ করিবে না।

রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুতে আশান্বিত হইয়া তাহারা মহোৎসাহে এ রাজ্য করায়ত্ত করিতে যত্নবান হইবে। সম্মুখে মহাবিপদ উপস্থিত। এ বিপদে তুমিই একমাত্র ভরসা। রাজ্যের সমস্ত প্রজা তোমার মুখপানে চাহিয়া আছে; তুমি তাহাদের রক্ষাবিধানে সচেষ্ট হও। বৎসে! গো. ব্রাহ্মণ রক্ষা কর, হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা কর। যবনগণ যেন দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিতে সমর্থ না হয়। মা! মহৎ কার্য্য এখন তোমার সম্মুখে। এই কার্য্য সাধন করিয়া দেহ ধারণের সার্থকতা সম্পাদন কর। তোমার অক্ষয় কীর্ত্তিতে ভুবন ভরিয়া যাউক।

গুরুদেবের উক্তিতে রাণী কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেব! আপনার আদেশ সর্ব্বথা

শিরোধার্য্য। কিন্তু আপনার জ্ঞানগর্ভবাক্যসকল শ্রবণ করিয়াও আমি শোক পরিহারে সমর্থ হইতেছি না। আমি পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ ও আনন্দের সহিত রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে পারিব বলিয়া বোধ হইতেছে না। তবে আপনার আজ্ঞা ও প্রতাপের প্রতি মমতাহেতু আমি দেহ রক্ষা করিব। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কয়েকজন মাত্র সহচরী সঙ্গে কাটশাকড়া শিবমন্দিরে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

কিছু দিন প্রতাপ আমার নিকট থাকুক। পরে তাহার শিক্ষার ভার আপনার উপর পড়িবে এবং আপনার আশ্রমেই সে বাস করিবে। সম্প্রতি রাজ্যের শাসনভার সেনাপতি ও দাওয়ানজির উপরই অর্পিত হউক। তাঁহারা বহুদর্শী ও কর্ম্মক্ষম। এ বিষয়ে আপনার অভিমত জানিতে পারিলে, কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদেরই হস্তে আমি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই।

রাণীর কথা শুনিয়া গুরুদেব বলিলেন, "বৎসে! অধিকাংশ বঙ্গবাসী আজকাল যেরূপ স্বার্থপর, অধার্ম্মিক, ও অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কাহারও উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষতঃ রাজ্যলোভ দুর্দ্দমনীয়! স্বার্থ ও রাজ্যলোভের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে কি না অকার্য্য, কুকার্য্য করিতে অগ্রসর

হয়? মা! তুমি কি জান না যে স্বার্থ ও রাজ্যলোভের বশবর্ত্তী হইয়া কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্র, বলপ্রয়োগে না পারিয়া ছলে ও কৌশলে দিল্লীশ্বর মহপরাক্রমশালী বীরাগ্রগণ্য পৃথ্বিরাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল? কেবল পৃথ্বিরাজের কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে। যাহার ফল প্রত্যেক হিন্দুনরনারী এখনও হৃদয়ে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেছে। ঐ পাপাত্মার পাপকার্য্যের বিষময় ফল কতকাল যে ভারত ভোগ করিবে তাহাই বা কে বলিতে পারে? পাপিষ্ঠ জয়চন্দ্র যদি ভারতে জন্মগ্রহণ না করিত তাহা হইলে কি আজ, মা! মুসলমানের ভয়ে সদা শঙ্কিত-চিত্তে বাস করিতে হইত? কখন্ তাহারা সতীর সতীত্ব-নাশ করে, কখন্ তাহারা হিন্দুর ধর্ম্মনাশ করে, কখন্ তাহারা দেবমন্দির চূর্ণ করে, এই ভয় হৃদয়ে পোষণ করিয়া কি আজ হিন্দু নরনারীকে হিন্দুস্থানে বাস করিতে হইত? লক্ষ্মণসেনের রাজত্বও ত মা, ঐরূপ বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই ধ্বংস হইয়াছে। তাহা না হইলে কি সপ্তদশ মাত্র অশ্বারোহী লইয়া ব্যক্তিয়ার খিলিজি বিনাযুদ্ধে রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে সাহসী হইত?

অতএব আমার দৃঢ় ধারণা রাজকার্য্যপরিচালনে বহু সমর্থ ব্যক্তি থাকিলেও সম্পূর্ণরূপে তাহাদের হস্তে রাজ্য ভার অর্পণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি তাহাদের উপর

রাজ্যভার ন্যস্ত হয় তাহা হইলে পাঠানগণ যে তাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাজ্যহরণের চেষ্টা করিবে না, ইহাই বা কে বলিতে পারে।

মা! আমি বারংবার বলিতেছি, আমার কথা অবহেলা করিও না। তুমি যদি কিছু মাত্র ঔদাসীন্য প্রকাশ না করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাজকার্য্য পরিদর্শন কর, তাহা হইলে রাজ্যের কোন ব্যক্তিই তোমার বিরুদ্ধাচারী হইতে সাহসী হইবে না।

বৎসে! এখন তোমার মহাবিপদের সময় উপস্থিত। প্রতাপের রাজ্য সযত্নে রক্ষা করিয়া প্রতাপের হস্তে যতদিন না অর্পণ করিতে পারিবে, ততদিন তোমার নিস্তার নাই। বিধবার ন্যায় ব্রহ্মচারিণী হইয়া কেবলমাত্র জপপূজাদি করিয়া কালাতিবাহন করিলেই চলিবে না। দিবসের অধিকাংশ সময়েই তোমাকে রণবেশে থাকিতে হইবে। আমার আদেশ, এক মুহূর্ত্তের জন্যও, এমন কি ভোজন কালে ও বিশ্রাম সময়েও, তুমি অস্ত্রত্যাগ করিতে পারিবে না। একটী আগ্নেয়াস্ত্র সর্ব্বদা নিকটে রাখিবে এবং জয়দুর্গা দেবী, তোমার পূজায় প্রীতা হইয়া আশীর্ব্বাদ স্বরূপ অতি অদ্ভুত উপায়ে যে কৃপাণ খানি তোমাকে দান করিয়াছেন, সেই কৃপাণখানি সর্ব্বদা কটিবন্ধে বাঁধিয়া রাখিবে। এবং তুমি স্বয়ং যে সমস্ত বলবতী রমণীকে যুদ্ধ

বিদ্যায় শিক্ষিতা করিয়াছ, তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী তাহাদিগকে দেহরক্ষিনী রূপে সর্ব্বদা নিকটে রাখিবে। সাবধান, তাহারা যেন ক্ষণকালের জন্যও তোমার সঙ্গভ্রষ্ট না হয়। এক কথায় তুমি সর্ব্বক্ষণই আত্মরক্ষা ও রাজ্যরক্ষার জন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিবে। কখনও আমার আদেশ লঙ্ঘন করিও না।

গুরুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণী ভবশঙ্করী বিনীত-ভাবে বলিতে লাগিলেন, "দেব! এক্ষণে আমি নিজের অবস্থা ও কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু শোকে আমার মন এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে, আমি কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। অনুমতি করুন, মনঃ স্থির করিবার জন্য অন্ততঃ মাসত্রয় আমার বিশ্বাসিনীসহ-চরীগণের সহিত কাটশাকড়া শিবনিবাসে গমন করিয়া বাস করি। সেখানে আমার স্বামীর প্রতিষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিয়া শোকাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করিব। এই মাসত্রয় আমি রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে পারিব না। আমার ইচ্ছা, মন্ত্রী ও সেনাপতির উপর এই কয় মাসের জন্য রাজকার্য্যের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করি।"

রাণী শোকনিবারণের জন্য কাটশাকড়া শিবনিবাসে কিছুকাল বাস করিবার জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিলে,

গুরুদেব অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাণীর কথায় সম্মত হইলেন। কিন্তু তিনি রাণীকে বলিয়া দিলেন, "বৎসে! তুমি যখন একান্ত আগ্রহপ্রকাশ করিতেছ, তখন শিবনিবাসে গিয়া কিছুকাল বাস কর; কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে কখনও বিস্মৃত হইও না।" অনন্তর গুরুদেব আশীর্ব্বাদ করিয়া রাণীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন।

দেবদত্ত অসি।

"জয়দুর্গা" অষ্টধাতুনির্ম্মিতা দশভূজা দুর্গামূর্ত্তি। ভুরশুটের ভরদ্বাজ রাজবংশের কুলদেবতা। এই মূর্ত্তি এখনও পেঁড়োরগড়ে পেঁড়োদুর্গাধিপতি রাজা নরেন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র কবিকুলকেশরী ভারতচন্দ্রের জ্ঞাতিবংশীয়গণের গৃহে বিরাজমানা থাকিয়া অর্চ্চিতা হইতেছেন। কথিত আছে, একসময়ে বীরা রাণী ভবশঙ্করী জয়দুর্গার পূজা করিয়া এই বাসনায় তাঁহার সম্মুখে হত্যা দেন যে, কোন বীরপুরুষ যেন তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে না পারে। অনাহারে, অনিদ্রায় প্রথম দিন গেল, দ্বিতীয় দিন গেল, রাণী মন্দিরের একপার্শ্বে করযোড়ে উপবিষ্টা, তৃতীয় দিবস মাধ্যাহ্নিক পূজাবসানে দৈববাণী হইল, "বৎসে! তোর বাসনা পূর্ণ হইবে। তুই আমারই শক্তিতে শক্তিমতী হইবি। আমি তোকে একখানি তরবারি দান করিতেছি—রাজবাটীর পূর্ব্ব

দিকে সরোবরের জলে তরবারিখানি নিমজ্জিত আছে। তুই এখনই উঠিয়া স্নানার্থ সেই সরোবরে গমন কর্। পুষ্করিণীতে নামিয়া কণ্ঠ পর্য্যন্ত জলে নিমজ্জিত করিলেই সেই মণিমণ্ডিত তরবারিখানি তোর হস্তগত হইবে। সেই তরবারি হস্তে থাকিতে, কেহই তোকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে না।"

রাণী ভবশঙ্করী দৈববাণী অনুসারে সরোবরে গমন করিয়া জলমধ্য হইতে একখানি অপূর্ব্ব তরবারি প্রাপ্ত হয়েন। তিনি সর্ব্বদাই এই তরবারিখানি অতি যত্নে সঙ্গে রাখিতেন। অদ্যাবধি সেই বিশ্ববিজয়ী তরবারির ভগ্নাবশেষ পেঁড়োরগড়ে রাণী ভবশঙ্করীর জ্ঞাতিবংশধরগণের গৃহে রক্ষিত আছে।

পাঠানদলপতি ওস্মানের সহিত রাণী ভবশঙ্করীর সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্ত্তীর ষড়যন্ত্র।

রাণী ভবশঙ্করী কাট্শাকড়া শিবনিবাসে বাস করিতে গমন করিয়াছেন। মন্ত্রী দুর্লভ দত্ত, সেনাপতি চতুর্ভুজের সাহায্যে রাজ্যশাসন করিতেছেন। প্রজাবৎসল রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুতে এবং সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীরূপিণী রাণী

ভবশঙ্করীর রাজকার্য্যত্যাগে প্রজাগণ অতিশয় বিমর্ষভাবে কালাতিপাত করিতেছে।

এদিকে রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া পাঠানদলপতি ওসমান ভুরস্থট রাজ্য অধিকারের আশায় কৌশলজাল বিস্তার করিতে প্রয়াসী হইলেন। ওসমান ভাবিলেন, এখন ভুরসিট্ট রাজ্য রাজাশূন্য, রাজপুত্র— অপ্রাপ্ত-বয়স্ক। রাণীই রাজ্যমধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা। এখন চেষ্টা করিলে তাঁহাকে হস্তগত করিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না। যদি একান্তই তাঁহাকে বশীভূত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে কৌশলে তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

ওসমান মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, একজন বিশ্বস্ত হিন্দু-কর্ম্মচারীকে,ব্রাহ্মণ-রাজ-সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্ত্তীর নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিলেন।

দূত গুপ্তভাবে চতুর্ভুজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ওসমানের উপদেশমত তাঁহাকে বলিল,—"হে বীরবর! উড়িষ্যাধিপতি পাঠানরাজ ওসমান বহু সম্মান জানাইয়া আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, রাজা রুদ্রনারায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী ভুর্‌স্থটের সকল নরপতিই বঙ্গীয় পাঠানভূপতি-গণের সহায় ছিলেন। কেবল রাজা রুদ্রনারায়ণই মোগলপক্ষ অবলম্বন করেন৭ রাজা রুদ্রনারায়ণ এক্ষণে ইহলীলা

সম্বরণ করিয়াছেন। রাণী ও তাঁহার শিশুপুত্র বর্ত্তমান থাকিলেও কার্য্যতঃ আপনিই এখন ভুর্‌সুট রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। আপনি যদি পাঠানরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া মোগলের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাকে সৈন্যাদির দ্বারা সাহায্য করেন, তাহা হইলে তিনি আশা করেন,বঙ্গদেশ মোগল-কবল হইতে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন, এবং আপনার সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ আপনাকে ভুরসিট্ট রাজ্যের অধীশ্বরপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবেন। আপনার অভিমত জানিতে পারিলে তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কার্য্যসিদ্ধিকর গুপ্ত পরামর্শ করিতে প্রস্তুত আছেন।"

ইহা বলিয়া দূত নীরব হইলে সেনাপতি বলিতে লাগিলেন, "মহাবীর ওস্‌মান বলিয়াছেন ব্রাহ্মণরাজগণ সকলেই পাঠান নরপতিগণের সহিত মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু রাজীবলোচনকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তদ্বারা হিন্দু-দেব-দেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করাইবার পর হইতেই রাজা রুদ্রনারায়ণ পাঠাননৃপতিগণের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েন এবং বঙ্গে পাঠানশক্তি ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে মোগলপক্ষ অবলম্বন করেন। রাজা রুদ্রনারায়ণ কতলুখাঁর পক্ষ ত্যাগ না করিলে, নিশ্চয়ই তিনি বঙ্গদেশ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু রাজা

রুদ্রনারায়ণ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া নবাগত অজ্ঞাতকুলশীল মোগলগণকে বিশ্বাস করিয়া যে তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার একেবারেই সম্মতি ছিল না। তৎকালে রাজাকে অনেক বুঝাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন, কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেন না। সেইজন্য সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও গড়মান্দারণে আমাকে পাঠানবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল।

এক্ষণে আমি পাঠানপক্ষ অবলম্বনে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক, এবং আশা করি, মন্ত্রী মহাশয়ও আমার কার্য্যে অনভিমত প্রকাশ করিবেন না। কিন্তু রাণীকে সম্মত করা অসাধ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি স্বামীর অনভিলষিত কোন কার্য্য প্রাণান্তেও করিবেন না। রাণী ভবশঙ্করী মহাশক্তিশালিনী, সমরকুশলা বীরাঙ্গনা। তাঁহার প্রতিজ্ঞা অটল। ভুরিসিট রাজ্যে এমন কোন বীরপুরুষ নাই যে, রাণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলিতে সাহসী হইতে পারে; এমন কি, আমিও সেই চামুণ্ডারূপিণী রমণীর নিকট শঙ্কিতভাবে অবস্থান করি। অতএব পাঠান-পক্ষ অবলম্বনের কথা কিছুতেই আমি রাণীর নিকট উত্থাপন করিতে পারিব না। তবে বীরশ্রেষ্ঠ ওসমান্ আপনার নিকট যাহা শপথ করিয়াছেন, তাহা যদি তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে ইতস্ততঃ না করেন, তাহা হইলে আমি

প্রতিজ্ঞা করিতেছি ভুরুসিট্ট রাজ্যের বহুসহস্র সমরকুশল সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইব এবং মোগলবিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব।

তিনি আমাকে ভুরিশ্রেষ্ঠপুরের অধীশ্বর করিবেন, স্বীকার করিয়াছেন। ইহা যদি সত্যসত্যই তিনি কার্য্যে পরিণত করেন, তাহা হইলে রাণীকে হস্তগত করিবার এক সুন্দর ও সহজ উপায় আমি বলিয়া দিতে পারি। রাণী স্বামীর মৃত্যুতে এখন শোকাতুরা হইয়া, রাজকার্য্য পরিদর্শন পরিত্যাগ করতঃ কাট্‌শাকড়া শিবনিবাসে কয়েকটীমাত্র সহচরী লইয়া বাস করিতেছেন। যদি এই সুযোগে নিশীথকালে তাঁহার বাসগৃহ আক্রমণ করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ধৃত হইবেন। তখন পাঠানরাজ ওস্‌মান তাঁহাকে হাতে পাইয়া, যে কোন উপায়ে স্বীয় বাঞ্ছিত সাধনের জন্য সম্মতা করিতে পারিবেন; এবং আমিও নির্ভয়ে পাঠানপক্ষ অবলম্বন করিতে পারিব।

সেনাপতির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া দূত বলিলেন,—"আপনি যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ একজন মহাবীরপুরুষ। আপনি মান্দারণের যুদ্ধে যে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অসাধারণ ও অত্যদ্ভুত। একজন নারীকে হস্তগত করিবার জন্য অতি কাপুরুষের ন্যায় কৌশলজালবিস্তারে প্রয়াসী হইতেছেন কেন? আপনি যদি পাঠানরাজের প্রস্তাবে সম্মত

হইয়া থাকেন, তাহা হইলে রাণীর অনিচ্ছাস্বত্বেও আপনি পাঠানপক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন। ভুর্‌সুটের সমস্ত যোদ্ধাই আপনার আজ্ঞাবহ; এমন কি, মন্ত্রী পর্য্যন্তও আপনার আয়ত্তাধীন। এরূপ অবস্থায় রাণীকে এত ভয় করিবার কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

দূতের সন্দেহ ভঞ্জন করিবার অভিপ্রায়ে সেনাপতি কহিলেন,—"আপনি কি রাণী ভবশঙ্করীর বীরত্বের কথা শুনেন নাই? তাঁহার রণরঙ্গিণীমূর্ত্তি দর্শনে মহাবীরের হৃদয়ও সভয়ে কম্পিত হইতে থাকে। মহাশক্তিরূপিণী রাণী অসিহস্তে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে, তাঁহার সম্মুখে স্থির থাকিতে পারে, এমন যোদ্ধা পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ।

তবে তিনি এখন স্বামিশোকবিধুরা হইয়া নির্জ্জনস্থানে কালাতিপাত করিতেছেন। এই সুযোগে সিংহীকে আনায়বদ্ধ করিতে না পারিলে পাঠান রাজের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার আর কোনও উপায় নাই। কিন্তু সাবধান, এই কার্য্য অতি সঙ্গোপনে সম্পন্ন করিতে হইবে। রাণী নিশীথকালে একাকিনী শিবাসাধনায় নিযুক্তা থাকেন, সেই সময়ে তাঁহাকে সহসা ধরিয়া ফেলিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। ধৃত হইবার পূর্ব্বে রাণী এই ষড়যন্ত্রের বিন্দুমাত্র অবগত হইলে, মহাবিপদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

রাণীকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার গুরুদেব স্থানে স্থানে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে ধৃত করিবার কার্য্যে আমি ত কোন সাহায্যই করিতে পারিব না, পরন্তু পাঠানরাজকেও অল্পসংখ্যক বিশ্বস্ত রণকুশল বলবান্ যোদ্ধাকে ছদ্মবেশে সজ্জিত করিয়া, তাহাদের সহিত ভুর্‌স্থট্ রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। যদি মোগলযুদ্ধে ভুর্‌স্থট্ সৈন্যের সাহায্য পাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমি যাহা যাহা করিতে বলিলাম, তাহা যেন বর্ণে বর্ণে প্রতি-পালিত হয়। নারী বলিয়া পাঠানরাজ যেন কিছুমাত্র অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন। তিনি যেন সর্ব্বদা মনে রাখেন যে তিনি এক প্রবল পরাক্রান্ত বীরকে ধৃত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। যদি বিন্দুমাত্র অসাব-ধানতা প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে আততায়িগণের মধ্যে একজনকেও জীবিত অবস্থায় ফিরিতে হইবে না। রণচণ্ডীর ভীষণ অসিমুখে সকলেরই মুণ্ড ভূলুণ্ঠিত হইবে।

পাঠানদলপতি ওস্‌মান যদি এই ভীষণকার্য্যসাধনে সমর্থ হয়েন, তবেই আমি তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে পারি, নচেৎ আমার নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্তির আশা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বলিবেন।" এই বলিয়া সেনাপতি দূতকে বিদায় দিলেন।

পাঠান দলপতি ওস্‌মান ও তাঁহার দ্বাদশ অনুচরের ছদ্মবেশ।

দূতের মুখে ভুরস্থটরাজসেনাপতি চতুর্ভুজের বাক্যশ্রবণ করিয়া পাঠান সর্দ্দার ওস্‌মান মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন— "সেনাপতি যখন রাণীকে করায়ত্ত করিবার গুপ্ত কৌশল বলিয়া দিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই রাজ্যপ্রাপ্তির প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া থাকিবে। পাপিষ্ঠ রাজ্যলোভে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অসহায়া রাণীকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত নহে। যাহা হউক, আমার কার্য্যসিদ্ধি হইলেই হইল। ভুরস্থট্ রাজ্য যদি আমার করায়ত্ত হয়, তাহা হইলে মোগল সমরে বিজয় লাভ করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা; কারণ ভুরস্থট রাজ্য শস্যসম্পদে সমৃদ্ধিশালী বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ এবং ভুরস্থটের সৈন্যগণ বলবিক্রমে ও রণকৌশলে মোগল, পাঠান সৈন্য অপেক্ষা কিছুতেই নিকৃষ্ট নহে। অতএব ভুরস্থটে সৈন্যস্থাপন করিয়া মোগলবিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, সেনাগণের আহারের অসদ্ভাব কখনও হইবে না, অধিকন্তু আমার সৈন্যবলও প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে এরূপ অবস্থায় রাণীকে যে প্রকারে হউক হস্তগত করা নিতান্ত আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন রাণী শৌর্য্যবীর্য্যবতী যুবতী এবং বঙ্গদেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। এরূপ

নারিরত্ন লাভও সৌভাগ্যের কথা। ইহাতে অধর্ম্মই বা কি? সুন্দরী রমণী ও বসুন্ধরা চিরকালই বীরভোগ্যা। যৌবনবতী রাণী এক্ষণে পতিহীনা। তাহাকে কোনও রূপে একবার হস্তগত করিতে পারিলেই, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সে আমার বশীভূত হইয়া পড়িবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।" পাঠান সর্দ্দার ওস্‌মান এইরূপ চিন্তা করিয়া কয়েকজন বিশ্বস্ত সমরদক্ষ অনুচরের সহিত ছদ্মবেশে ভূর্‌সুট রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

কাটশাকড়া শিবমন্দিরে রাণী ভবশঙ্করী।

স্বামীর মৃত্যুর পর রাণী ভবশঙ্করী কাটশাঁকড়া শিব মন্দিরে বাস করিতেছেন। রাণীর দেহরক্ষিনী সমরনিপুণা বিংশতি বিশ্বস্তা সহচরী তাঁহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা আছে। প্রতিদিন মহাড়ম্বরে পূজা হইতেছে এবং আগত ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকগণ পরম পরিতোষের সহিত পান, ভোজনাদি করিতেছে। প্রতি রজনীতে শিবনাম কীর্ত্তন হইতেছে। কাট্‌শাঁকড়া গ্রাম উৎসবানন্দে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই পূজাদর্শন, প্রসাদ ভক্ষণ ও নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। রাণী এইরূপে দিনপাত করিতেছেন,

এমন সময় একদিন গুরুদেব আসিয়া শিবমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। রাণী পাদ্য, অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তৎপরে গুরুদেব উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইলে, রাণী তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। অনন্তর গুরুদেব রাণীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা! তুমি শিবনিবাসে আগমন করিলে সেনাপতির কার্য্যাদি-দর্শন করিয়া তৎপ্রতি আমার কিছু সন্দেহ উপস্থিত হয়; তজ্জন্য আমি তোমার রক্ষাবিধানে কতকগুলি গুপ্তচর নিযুক্ত করি। অদ্য প্রাতঃকালে একজন চর আমতা হইতে আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে, বার তের জন অপরিচিত ব্যক্তি ছদ্মবেশে আমতার বাজারে বাস করিতেছে। যদিও তাহারা হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা হিন্দু নহে, সকলেই মুসলমান এবং অমিতবলশালী বলিয়া বোধ হয়। আমার নিযুক্ত চরও সন্ন্যাসীর বেশে আমতার বাজারে ছিল। ছদ্মবেশধারিগণ তাহাকে কথায় কথায় বলে যে রাণী ভবশঙ্করী কাটশাকড়া গ্রামে প্রতিদিন সন্ন্যাসী ভোজন করাইতেছেন; সেইজন্য তাহারা কাট-শাকড়া গ্রামে যাইতে ইচ্ছুক। শীঘ্র তাহারা আমতা হইতে কাটশাকড়া গ্রামে গমন করিবে।

গুপ্তচরের মুখে, এই কথা শুনিয়া এবং সেনাপতির ভাবগতিক দেখিয়া আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছি। আমার

মনে যেন স্বতঃই উদয় হইতেছে যে সেনাপতি বোধ হয় পাঠান দলপতির সহিত মিলিত হইয়া তোমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করিয়া থাকিবে। পাঠানগণের অনেক অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও রাজা রুদ্রনারায়ণ মোগলপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই হেতু পাঠানগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিল, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় তাহারা তাঁহার উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহসী হয় নাই; এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুতে অবসর বুঝিয়া বোধ হয় সেনাপতিকে হস্তগত করিয়াছে।

যাহা হউক, মা! তুমি অদ্য রজনীতে বিশেষ সতর্ক থাকিবে। সন্ধ্যার পর হইতেই দেবদত্ত অসি কটিবন্ধে আবদ্ধ রাখিবে। দেহরক্ষিণিগণ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অতি সাবধানতার সহিত সমস্ত রাত্রি প্রহরীর কার্য্যে যেন নিযুক্ত থাকে! আর যদি তোমার মত হয় তাহা হইলে রাজধানী হইতে কতকগুলি বিশ্বস্ত যোদ্ধা এখনই এখানে আনাইবার জন্য সেনাপতিকে বলিয়া পাঠাই।

গুরুদেবের কথা সমাপ্ত হইলে রাণী নির্ভীকভাবে বলিতে লাগিলেন, "দেব! বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই এবং রাজধানী হইতে সৈন্য আনাইবারও আবশ্যকতা দেখিনা। প্রকৃতই যদি বার তের জন পাঠান আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য রজনিযোগে শিবমন্দিরে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দাসী আপনার আশীর্ব্বাদে একা-

কিনীই, বোধ হয়, তাহাদের মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থা হইবে ; এতদ্ভিন্ন আমার অনেকগুলি সহচরী এখানে উপস্থিত আছে। তাহাদের বীরত্ব ও রণকৌশল আপনার নিকট অবিদিত নাই। যদিই এই অনুমিত অশুভ ঘটনা সংঘটিত হয়, আপনার আশীর্ব্বাদ থাকিলে তাহা হইতে নিশ্চয়ই উদ্ধার পাইব, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপনি নিশ্চিন্ত মনে গৃহগমন করুন।” এই বলিয়া রাণী গুরু-পদতলে মস্তক লুণ্ঠিত করিলেন, গুরুদেবও আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ওসমান ও তদীয় অনুচরগণ কর্ত্তৃক নিশীথসময়ে শিবমন্দির আক্রমণ।

রাণী সন্ধ্যাসমাগমে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া রণবেশে সুসজ্জিতা হইলেন এবং তদুপরি একখানি শ্বেত পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন। সহচরিগণও অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়া বর্ম্মাবৃতদেহে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রচ্ছন্নভাবে অব-স্থান করতঃ শত্রুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রাণী মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া শিবলিঙ্গের সম্মুখে একখানি সুপ্রশস্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম পাতিলেন এবং তদুপরি উপবিষ্টা হইয়া তন্ময়চিত্তে শিবারাধনায় নিযুক্তা হইলেন। রাণীর

সম্মুখে দেবদত্ত উলঙ্গ কৃপাণ দীপালোকে ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল। বামদিকে একখানি বিশাল ঢাল শোভা পাইতেছিল। রাণীর বদনমণ্ডল আজ অপূর্ব্ব দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে চিরপরিচিত, প্রাণপ্রিয়, অকপট, অমিতশক্তিশালী কোন এক বন্ধুর সহিত মিলিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয়ে অদম্য তেজের আবির্ভাব হইয়াছে; যেন শত্রুদমন করিবার জন্য তাঁহার দেহমধ্যে মহাশক্তির চমকপ্রদ ক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে; সেই ক্রীড়াতরঙ্গে তপ্তকাঞ্চনাভাপূর্ণ শরীর হইতে এক অত্যদ্ভুত জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া মন্দিরতল দিব্যালোকে আলোকিত করিয়াছে।

ঘোরা রজনী। সমস্ত নরনারী নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিতেছে। গ্রামখানি নিস্তব্ধ। এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধ্যে মধ্যে শৃগাল ও কুক্কুরগণ বিকট চিৎকার করিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে পেচকের কর্কশ রব শ্রুতিগোচর হইতেছে। এই কালনিশায় সদাগতিও ভীতিপূর্ণ পদসঞ্চারে উন্নতবৃক্ষশিরে লুক্কায়িত হইতেছে। এ হেন ভীষণ সময়ে ধরাতলে কত অকর্ম্ম, কত কুকর্ম্ম সংসাধিত হয় দেখিবার জন্যই যেন অমরগণ গগনমণ্ডলে সহস্র লোচন বিস্ফারিত করিয়া পৃথিবীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। এই ভীষণ রজনীতে হঠাৎ অদূরে মনুষ্যপদবিক্ষেপ শব্দ কর্ণগোচর হইল। রাণীর দেহরক্ষিণী বীরাঙ্গনাগণ নিষ্কোষিতঅসিহস্তে

ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কতকগুলি রমনী রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে দক্ষিণ করে বর্ষা উত্তোলন করিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল।

মন্দির হইতে কিছু দূরে এক বিভীষণ নারিকণ্ঠস্বর নিশীথিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিগ্দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রমণী গর্ব্বিতভাবে চিৎকার করিয়া বলিল, "যেহও, সে হও; পরিচয় প্রদান না করিয়া একপদ অগ্রসর হইলেই মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইবে।" অপরিচিত ব্যক্তি বাক্যব্যয় না করিয়া অসি নিষ্কোষিত করিল। রমণী বাঘিনীর ন্যায় লম্ফপ্রদান করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। অসির ঝন্‌ঝনা শব্দে দিঘ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল। পাঠান বীরগণ একত্রিত হইল। রাণীর শরীররক্ষিণী বীরাঙ্গনাগণও সকলেই সেইদিকে ধাবিত হইল। ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শব্দে রাণীর ধ্যান ভঙ্গ হইল! তিনি বাম হস্তে চর্ম্ম ও দক্ষিণ হস্তে দেবদত্ত অসি ধারণ করিয়া দৈত্যদর্পনিসূদনী, করালিনী রুদ্রাণীরূপে মন্দিরদ্বারে দণ্ডায়মানা হইলেন।

রাণীর দেহরক্ষিণিগণ পাঠানবীরগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছে দেখিয়া, পাঠান দলপতি বীরবর ওস্মান রাণীর উদ্দেশ্যে গুপ্তভাবে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক বৃক্ষান্তরাল হইতে মন্দিরদ্বারে

রাণীর অপূর্ব্ব বিদ্যুতাকৃতি রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর করিয়া ওসমান মহাবিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি গুপ্ত স্থানে অদৃষ্ট থাকিয়া কিয়ৎক্ষণ সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আবাসভূমি মহামহিমময়ী মূর্ত্তি নিস্পন্দভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "মন্দিরদ্বারে এই রমণী মূর্ত্তি কে? এ দেবী, না মানবী? এরূপ নারী ত কখনও নয়নগোচর করি নাই। এত সুন্দর, এত মধুর, এত মহিমাময়, এত স্থির শান্ত অথচ গুরুগম্ভীর, এত গর্ব্বপূর্ণ অথচ সহাস্য, এত ভ্রুকুটিকুটিল অথচ মনোরম বদনমণ্ডল ত কখনও দেখি নাই। ইনিই কি রাণী ভবশঙ্করী? এক হাতে চর্ম্ম, এক হাতে অসি; যেন শক্রদর্প খর্ব্ব করিবার জন্য স্বয়ং বীরত্ব মনোহারিণী রমণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐ মন্দির দ্বারে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ওসমান রাণীর অপরূপ রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতে করিতে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। রাণীর সহচরিগণ তাঁহাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া যে পাঠান বীরগণের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছে এবং এই অবসরে যে তিনি রাণীকে হস্তগত করিবার জন্য মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন এ কথা ওসমান একেবারেই বিস্মৃত। তাঁহার বাহ্য জ্ঞান এক প্রকার বিলুপ্ত। কল্পনার সুখময় স্বপ্নরাজ্যে এখন তিনি আনন্দপূর্ণ স্বপ্নঘোরে বিমোহিত। এমন সময় নারি-

কণ্ঠবিনিঃসৃত তীব্র ভর্ৎসনা বাক্য দূর হইতে তাহার শ্রুতিগোচর হইল। ভীষণ গর্জ্জন করিয়া রমণিগণ বলিতেছে "ভীরু! কাপুরুষ! স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে যাহারা লজ্জাবোধ করে না, তাহাদের জীবনে ধিক্! তাহাদের অস্ত্রধারণে শত ধিক্! প্রাণের মমতা যদি এতই প্রবল, তবে কোন্ সাহসে শৃগাল হইয়া সিংহীর গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিলি? যা, কুক্কুর! প্রাণ লইয়া প্রস্থান কর; তোদের ঘৃণিত রক্তে আমাদের পবিত্র অসি আর কলঙ্কিত করিব না।"

এই ভর্ৎসনা বাক্য শুনিয়া ওস্‌মানের চমক ভাঙ্গিল। তিনি প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার অনুচরগণ যে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে আর তাঁহার বাকী রহিল না। এখন তাঁহার প্রাণে ভয় হইল। রাণীকে হস্তগত করিবার আশা তাঁহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হইল। স্বীয় প্রাণরক্ষার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। একবার মনে করিলেন—অঙ্গনাগণের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। আবার ভাবিলেন—একাকী এতগুলি সমর-নিপুণা রমণীর সহিত রণে নিযুক্ত হওয়া বাতুলতা মাত্র। ইহাতে পরাজয় অনিবার্য্য, এমন কি, জীবননাশ হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় গুপ্তভাবে পলায়নই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অনুচরগণের মধ্যে বোধ হয়,

অনেকেই নিহত। অবশিষ্ট পলায়ন করিয়াছে। অতএব উহাদের অপেক্ষা না করিয়া শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নচেৎ এখনই বীরাঙ্গনাগণ বিজয়োল্লাসে এ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং আমিও নিরাশ্রয় শিশুর ন্যায় তাহাদের হস্তে ধৃত হইব। ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা সমস্তই নির্ম্মূল হইবে। হয়, চিরকাল বন্দীভাবে কালযাপন করিতে হইবে, না হয়, রমণিকরচালিত কৃপাণ-তাড়নে এখনই মস্তক দেহবিচ্যুত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইবে। এইরূপ ভাবিয়া পাঠানসর্দ্দার ওস্‌মান ভগ্ন-হৃদয়ে একাকী বনপথে গুপ্তভাবে প্রস্থান করিলেন।

সহচরিগণের বিজয়োল্লাসধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাণী ভীষণ শঙ্খনাদ করিতে করিতে যুদ্ধস্থলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দেবালয়ের ভৃত্যগণ এতক্ষণে সাহস পাইয়া চতুর্দ্দিকে মশাল জ্বালিয়া দিল। রাণী যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, হতব্যক্তিগণের আকৃতি পাঠান বীরগণের ন্যায়। অনন্তর তিনি মৃতদেহরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রাণী ভবশঙ্করীর রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন ও রাজকার্য্যে মনোনিবেশ।

এই অভাবনীয় ঘটনা দর্শনে রাণীর মনে নানাপ্রকার

সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'রাজার মৃত্যুর পর অত্যন্ত শোকবিহ্বলা হইয়া রাজ্যশাসনের ভার তিনি মন্ত্রী ও সেনাপতির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন এবং ভগবৎ-আরাধনায় প্রাণে শান্তিলাভ করিবার জন্য শিবনিবাসে আসিয়া বাস করিতেছেন। এই সুযোগে বোধ হয়, মন্ত্রী কিম্বা সেনাপতি নৃপতিবিহীন রাজ্য হস্তগত করিবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়া থাকিবে। তাঁহাকে শিবমন্দিরে গুপ্তভাবে হত্যা করিবার জন্যই তাহারা পাঠানদস্যুদিগকে পাঠাইয়া থাকিবে।'

আবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—'রাজা রুদ্রনারায়ণ মোগলপক্ষ অবলম্বন করায় পাঠানদলপতি তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার পরাক্রম দেখিয়া তাঁহার জীবিতাবস্থায় তৎপ্রতি কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হয় নাই। এক্ষণে প্রতিহিংসা লইবার জন্য বোধ হয়, প্রথমে তাঁহার যুবতী ভার্য্যাকে করায়ত্ত করিয়া অবশেষে সহজে রাজ্যলাভ করিবার আশায় এইরূপ কাপুরুষোচিত ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।'

যাহাই হউক, কিন্তু পাপিষ্ঠগণ কি জানে না যে, বীর-শ্রেষ্ঠ মহারাজ রুদ্রনারায়ণের সহধর্ম্মিণী ভবশঙ্করী দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করে নাই। তাহারা কি বুঝে নাই যে ভবশঙ্করী জীবিত থাকিতে অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজপুত্র প্রতাপনারায়ণের রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

যদি না বুঝিয়া থাকে, শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে। গুরুদেবের উপদেশ না শুনিয়া যথার্থই অন্যায়কার্য্য করিয়াছি। তিনি যদি এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমাকে সতর্ক করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে যে কি অনর্থপাত হইত, তাহা ভাবিলে সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠে। যাহা হউক, এক্ষণে রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া শিবমন্দিরে বাস করা কিছুতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। আমাকে হস্তগত কিম্বা হত্যা করিয়া শিশু রাজ-পুত্রকে নিহত করিতে পারিলেই দুরাত্মাগণের মনোভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাণীর ক্রোধানল হৃদয়-কন্দরে জ্বলিয়া উঠিল। রাজার মৃত্যুজনিত শোক এই ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি দান করিতে লাগিল। অবিলম্বে রাজ্য-শাসনভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়া দুর্ব্বৃত্তদলন করি-বার আশায় সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে এবং নিজে রণরঙ্গিণী-মূর্ত্তিতে সৈন্যগণের যুদ্ধশিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গুরুদেবের কথা শুনিয়াই রাণী সেনাপতির উপর সংশয়াবিষ্টা হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেনা-পতির হস্ত হইতে সৈন্যচালনার ভার সম্পূর্ণরূপে স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। শিবমন্দিরে আর কাল-ক্ষেপ না করিয়া পরদিন প্রাতঃকালেই তিনি রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুতে ও রাণীর রাজকার্য্যে উদাসীনতায় দেশের অবস্থা।

রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর রাণী যখন কাট্‌শাঁকুড়া শিবমন্দিরে বাস করিতেছিলেন, তখন ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা ভুর্‌সুটে প্রচলিত নিম্নলিখিত ছড়াটি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

"সেনাপতি চতুর্ভূজ,
দাওয়ান দুর্লভ দত্ত;
রাণী থাকে কাট্‌শাঁকড়ায়,
রাজ্য হ'লো লণ্ডভণ্ড।
আয় রাণী মা,
আয় গো ফিরে,
তোর তরে যে নয়ন ঝুরে।
সোনার দেশ হ'লো মাটি,
লুটেছে যে পাষণ্ড॥
পাঠান করে আনাগোনা,
ভয়ে প্রাণ বোধ মানে না
ধর্ মা অসি মুক্তকেশী,

মুসলমানে দে গো হানা
নহিলে দেশ বাঁচে না ॥
বাপ্ গেল মা আশা ছিল,
মায়ের কোলে থাক্‌বো ভাল,
কেমনে নিষ্ঠুর হ'য়ে,
গেলি গো মা ছেড়ে দিয়ে
আশা ভরসা হলো যে মা
তোর বিহনে সব পণ্ড ॥"

এই ছড়াটী এখনও ভুর্‌সুটের অনেক রমণীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্ত্তীর স্বার্থপরতায় দেশের মধ্যেও যে সেই সময়ে মহা অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এই গান হইতে সহজেই বোধগম্য। রাজার মৃত্যুর পর রাণী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কাটশাঁকড়া শিবনিবাসে বাস করিতে আরম্ভ করিলে, প্রজাগণ রাণীকে রাজদণ্ড পরিচালন করিবার জন্য অতি কাতরতার সহিত আহ্বান করিয়াছিল। রাণীও সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিতে পারিয়া এবং প্রকৃতিপুঞ্জের সনির্ব্বন্ধ অনুনয় অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

তেজস্বিনী রাণী রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া সুশৃঙ্খল-ভাবে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে

গুরুতর ষড়যন্ত্র হইতেছে অনুমান করিয়া, তিনি আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিলেন।

পাপাত্মা সেনাপতির রাজ্যশাসন-ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দিলেন; সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের শিক্ষা ও পরিচালনভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে দেশে শান্তিস্থাপন করিয়া রাণী নির্ভীকভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

রাণীকে হস্তগত করিবার জন্য ওস্‌মানের চেষ্টা।

ওস্‌মান মন্দির-প্রাঙ্গন হইতে গুপ্তভাবে প্রস্থান করিয়া নিরাপদে উড়িষ্যায় পোঁছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ-মন শিবমন্দিরেই রহিয়া গেল। তাঁহার মানসচক্ষে রাণী ভবশঙ্করীর সেই দিব্যমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ প্রতিভাত হইতে লাগিল। তিনি যেন দেখিতে লাগিলেন—রাণী বামহস্তে চর্ম্ম ও দক্ষিণহস্তে অসি ধারণ করিয়া মন্দির-দ্বারে দণ্ডায়মানা। আলুলায়িত সুচিক্কণ কেশপাশ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে দোদুল্যমান, দুই একটী ভ্রমর-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কুন্তল-গুচ্ছ সুবর্ণসুন্দর ললাট-তলে ও গোলাপ-গঞ্জিত গণ্ডদেশে মৃদুপবনে ঈষৎ সঞ্চালিত। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গবর্ষী আরক্তিম আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগলের

উপরিভাগে সুবঙ্কিম সূক্ষ্ম ভ্রূযুগ সামান্য কুঞ্চিত, ক্ষুদ্ররক্ত তিলফুলনাসিকা ঘনঘনশ্বাস-বিস্ফারিত, প্রবাল-গঞ্জিত নবনীতকোমল অধরোষ্ঠ ক্রোধবিকম্পিত, মুখমধ্যে দুই একটী মুক্তানিন্দিত দন্ত সুপ্রকাশিত। সুন্দর গ্রীবাদেশ বামপার্শ্বে ঈষৎ হেলায়িত। পীনোন্নত সুবিশাল বক্ষঃদেশ পট্টবস্ত্রে আচ্ছাদিত। গুরু নিতম্বের উপর সঙ্কীর্ণ কটিতট সুশোভিত। জগৎশাসন করিবার জন্যই যেন মহাশক্তিরূপিণী, মোহিনীমূর্ত্তিতে অবতীর্ণা। এই ভয়ঙ্করী অসামান্যলাবণ্য-বতীরমণীরত্ন লাভ করিবার জন্যই ওসমান উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রবল মোগলদিগকে ভুলিয়া রাণী ভব-শঙ্করীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর ওসমান চতুর্ভুজকে বশীভূত করিয়া রাণী ভবশঙ্করীকে ছলে-বলে-কৌশলে হস্তগত করিবার জন্য বহুমূল্য মণি-মাণিক্য—উপহারের সহিত একজন ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ দূতকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। ছদ্মবেশী দূত চতুর্ভুজের বাটীতে আসিয়া আতিথ্যগ্রহণ করিল এবং ওসমানদত্ত উপহার গোপনে প্রদান করিয়া তাঁহাকে বলিল, "পাঠানরাজ আপনার বিশ্বাস.উৎপাদন করিবার জন্য এই মহামূল্য রত্নাদি আপনাকে উপহার দিয়াছেন এবং আরও তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যদি আপনি রাণী ভব-শঙ্করীকে কোন কৌশলে তাঁহার আয়ত্তে আনিয়া দিতে

পারেন, তাহা হইলে তিনি ভুরস্নুট রাজ্য জয় করিয়া আপনাকে অর্পণ করিবেন। এখন আপনার মন্তব্য কি প্রকাশ করিয়া বলুন।”

চতুর্ভুজ ওস্মানদত্ত রত্নাদি-লাভে অত্যন্ত আহ্লাদিত ও ভবিষ্যতে রাজ্যলাভের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া দূতকে বলিতে লাগিল,—“যাহাতে পাঠানদলপতির মনোভীষ্ট পূর্ণ হয়, তদ্বিষয়ে আমি যত্নবান্ আছি; কিন্তু আমি সচেষ্ট থাকিলেই কার্য্য সফল হইবে না। তাঁহার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। আমার উপদেশানুসারে তিনি কয়েকজন অনুচর লইয়া নিশীথকালে ছদ্মবেশে কাটশাঁকড়া শিবমন্দিরে রাণীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাণীর অনুচরিগণের সহিত যুদ্ধেই পশ্চাৎপদ হইয়া পলায়ন করিয়াছেন।”

“যে বীরপুরুষ দুই চারিজন সামান্যা রমণীর সহিত যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন—মহাশক্তিশালিনী, বীরাগ্রগণ্যা রমনী রাণী ভবশঙ্করীকে লাভ করিতে চেষ্টা করা তাহার পক্ষে বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সিংহ ভিন্ন অন্য কেহ সিংহীকে বশীভূত করিতে পারে না। ওস্মানকে মহাবীর বলিয়াই আমার ধারণা ছিল, কিন্তু শিবমন্দিরের ঘটনা দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছে, এবং ঐ ঘটনার পর হইতে রাণীও আমার উপর সন্দিহান হইয়াছেন।

"ছলে ও কৌশলে রাণীকে হস্তগত করিবার আশা দুরাশা মাত্র। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত উন্নত, তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ, তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য সাহস ও রণকৌশল অসামান্য। তিনি সমস্ত গুণের আধার। প্রজাগণ সকলেই তাঁহাকে জগদ্ধাত্রীরূপে উপাসনা করে। পাঠান-দলপতি ওস্মান রাণীর অগ্নিশিখাবৎ জ্বলন্ত চক্ষুর দিকে, বোধ হয়, চাহিতেই সমর্থ হইবেন না। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, রাণীকে লাভ করিতে চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি ত তাঁহাকে পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছিলাম যে, তিনি যদি নিশীথকালে শিবমন্দিরে রাণীকে হস্তগত করিতে না পারেন, তাহা হইলে আর যেন আমার সাহায্যের আশা না করেন। তিনি সে কার্য্যে বিফল-মনোরথ হইয়া আবার কেন অগ্নিমধ্যে ঝম্পপ্রদান করিতে ইচ্ছুক হইতেছেন, বুঝিতে পারি না।

চতুর্ভুজের বাক্য শ্রবণ করিয়া দূত বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, "রাণী মহাশক্তিশালিনী রমণী বলিয়াই ত পাঠান-রাজ আপনার সাহায্যপ্রার্থী। আপনার অসাধারণ বীরত্বের উপর নির্ভর করিয়াই ত তিনি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছেন। আপনি যদি পাঠান বীর-গণের ও আপনার অধীন সৈন্যগণের সাহায্যে রাণীকে ধৃত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে মহাশক্তিশালিনী

হইলেও রাণী আত্মরক্ষা করিতে কিছুতেই সমর্থা হইবেন না। যদি আপনার ভুরস্থটরাজ্য লাভ করিবার আশা থাকে তাহা হইলে ওস্‌মানের সহিত মিলিত হইয়া আপনি রাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করুন। ইহাতে চক্ষুলজ্জা থাকিলে চলিবে না। আর যদি পাঠানরাজকে সাহায্য করা আপনার অভিপ্রেত না হয়, তাহাও প্রকাশ কলিয়া বলুন। তাঁহার শক্তি থাকে—তিনি আপনার সাহায্য ব্যতিরেকেই ভুরস্থট রাজ্য অধিকার করিবেন। তিনি মোগলদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য যে বিরাট আয়োজন করিতেছেন; এক্ষণে না হয় মোগল আক্রমণ স্থগিত রাখিয়া ভুরস্থটই আক্রমণ করিবেন। ভুরস্থটের কত শক্তি যে পাঠান দলপতি ওস্‌মানের সে ভীষণ আক্রমণবেগ সহ্য করিতে পারে। পাঠানরাজ যখন রাণীকে অঙ্কশায়িনী করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন তিনি যে কোনপ্রকারে হউক, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি কি করিবেন—বিবেচনা করিয়া বলুন, আমি শীঘ্র গমন করিয়া পাঠানরাজকে জ্ঞাপন করি।"

দূতের কথায় চতুর্ভুজ উত্তর করিল,—"আমি জানি—পাঠানসর্দ্দার ওস্‌মান একজন মহাবীরপুরুষ এবং তিনি যদি সসৈন্যে ভুরস্থট আক্রমণ করেন, তাহা হইলে তিনি এই ক্ষুদ্র রাজ্য বিধ্বস্ত করিতেও পারেন; কিন্তু এই রাজ্য

বিধ্বস্ত করিতে তাঁহাকেও এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হইবে যে, তিনি আর কখনও মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে রাণীকে কখনও তিনি বশীভূত করিতে পারিবেন না। তবে সুকৌশলে যুদ্ধ করিতে পারিলে তাঁহাকে ধৃত করিতে পারেন। আমি রাণীর গতিবিধি ও তাঁহাকে আক্রমণ করিবার সুযোগমাত্র জ্ঞাপন করিতে পারি, কিন্তু সসৈন্যে ওস্‌মানের সহিত মিলিত হইয়া, রাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারি না। কারণ, সৈন্যগণ যদি বুঝিতে পারে যে, আমি রাণীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই আমার আদেশানুসারে কার্য্য করিবে না, অধিকন্তু তাহারা আমায় নিহত করিবে। এরূপ অবস্থায় পাঠানসর্দ্দার ওস্‌মানের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকিলেও আমি প্রকাশ্যভাবে রাণীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিব না।"

চতুর্ভুজের বাক্য শ্রবণ করিয়া দূত বলিলেন,—"আপনি কিরূপ সুযোগে রাণীকে আক্রমণ করিতে পরামর্শ দেন। এবং কি প্রকার কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিলেইবা তাঁহাকে ধরিতে পারা যায়?"

ইহার উত্তরে চতুর্ভুজ বলিলেন,—"আজ কাল রাণী প্রায়ই ছাউনাপুর দুর্গে গমন করেন এবং সেখানে তিন

চারিদিন অবস্থান করেন। এই দুর্গের প্রায় দুই তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে বাগুড়ি গ্রামে তিনি এক দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই দেবীকে তিনি 'ভবানী' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। রাণী ছাউনাপুর দুর্গে গমন করিলেই অল্প-সংখ্যক লোকজন সমভিব্যাহারে এই ভবানীদেবীর পূজা করিবার জন্য অন্ততঃ একদিন বাগুড়ি গ্রামে গমন করেন।

রাণী যখন পূজায় নিযুক্তা থাকিবেন, সেই সময়ে ওস্মান যদি সসৈন্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারেন, তবেই তিনি রাণীকে ধরিতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশ অতিক্রম করিয়া বাগুড়ী গ্রামে উপস্থিত হইতে হইবে। পাঠানসৈন্য ভুরস্বুটরাজ্যে প্রবেশ করিলেই আমি সসৈন্যে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার ছলে পাঠানসৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইব। পাঠান-সৈন্যগণও যেন ভয়ে উত্তরদিকাভিমুখে পলায়ন করিবে, এবং আমিও আমার সৈন্যগণের সহিত তাহাদের পশ্চাদ্ধাব-মান হইব। পরে পাঠান সৈন্য ছাউনাপুর দুর্গের নিকট-বর্ত্তী হইলে, আমিও সসৈন্যে রাজধানী অভিমুখে ফিরিয়া আসিব। আমার সৈন্যগণকে তখন এই বলিয়া বুঝাইতে পারিব যে, শত্রুগণ ছাউনাপুর দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং রাণী স্বয়ং এই দুর্গে অবস্থিতি করিতেছেন; অতএব

দুর্গস্থ সেনাগণ এই পলায়মান শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিতে পারিবে। আমরা রাজধানীতে ফিরিয়া যাই চল। কারণ রাজধানী অরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে; কি জানি যদি কৌশলী পাঠানগণ অন্য সৈন্যদল লইয়া রাজধানী আক্রমণ করে। এইরূপে কার্য্য করিলে আমার সৈন্যগণ এমন কি রাজ্যস্থ কোন ব্যক্তি আমার উপর সন্দেহ করিতে পারিবে না, আর পাঠানসৈন্যগণও নিরাপদে ভুর্‌স্থুটরাজ্য অতিক্রম করিয়া ছাউনাপুর দুর্গের নিকটস্থ হইতে পারিবে।"

"এই কৌশলে রাণীকে আক্রমণ করিতে পারিলে বোধ হয় পাঠান-দলপতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। এক্ষণে আপনি উড়িষ্যায় গমন করিয়া ওস্‌মানকে এই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে বলুন। আর তিনি যেন নির্দ্দিষ্ট দিনে ভুর্‌স্থুট রাজ্যে প্রবেশ করেন। রাত্রিযোগে প্রবেশ করিয়া গোপনে গোপনে বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িতে পারিলেই ভাল হয়। তাহা হইলে বিপদের আশঙ্কা কমিয়া যায়। কারণ, রাজ্যমধ্যে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইলে, পাঠানসৈন্য ছাউনাপুরের নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই রাণী এই সংবাদ পাইয়া সতর্ক হইতে পারেন। পাঠানসৈন্যগণের দ্বারা আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই যদি রাণী এই বিষয় অবগত হয়েন, তাহা হইলে মহাবিপৎপাতের সম্ভাবনা।

কারণ রাণী সসৈন্যে পাঠানগণকে বাধা দিবার জন্য বহির্গত হইলে আমাকেও সসৈন্যে তাহার সহিত যোগদান করিতে হইবে। তাহা হইলে সম্মুখে ও পশ্চাতে আক্রান্ত হইয়া পাঠানসৈন্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।"

রাণী রণরঙ্গিণীমূর্ত্তিতে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণা হইয়া আহ্বান করিলে, শুধু সৈন্যগণ কেন, রাজ্যমধ্যে এমন একটীও মানব থাকিবে না, যে রাণীর জন্য স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত সানন্দে বিসর্জ্জন করিতে পরাঙ্মুখ হইবে। অতএব পাঠানদলপতি অতি সতর্কতার সহিত যেন রাণীকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হয়েন। বহুসংখ্যক সৈন্য আনয়নের কোন আবশ্যকতা নাই। কারণ তাহাতে গুপ্তষড়্যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। পাঁচ ছয়শত বিখ্যাত বীর যোদ্ধার সহিত রজনীর অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া রাণীকে মন্দিরমধ্যে সহসা আক্রমণ করিতে পারিলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করা যায়। কারণ, রাণী অসাধারণ শক্তিশালিনী সমরনিপুণা বীরাঙ্গনা হইলেও, একাকিনী যুদ্ধ করিতে সাহস করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। আর যদিই তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়েন, তাহা হইলে এত অধিকসংখ্যক বীরপুরুষের সহিত যুদ্ধে শীঘ্রই নিরস্ত্র ও পরাস্ত হইবেন। তখন তাঁহাকে হস্তগত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না।"

রাণীভবশঙ্করীকে অপহরণ করিবার জন্য ওস্‌মানের যুদ্ধযাত্রা।

দূত যথাসময়ে উড়িষ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ওস্‌মান দূতের নিকট সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। একবার তিনি মনে করিলেন এ বিপজ্জনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। রাণী যেরূপ শক্তিশালিনী তাহাতে সেনাপতি চতুর্ভূজ বিশেষ কোন সাহায্য করিতে সাহসী হইবে না। অধিকন্তু রাণী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলে সেনাপতি আমারই বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। আমি যদি সেনাপতির উপদেশমত গুপ্তভাবে এতদূর পথ অতিক্রম করিয়া রাণীকে হঠাৎ আক্রমণ করিতে কোনওপ্রকারে অকৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে আর আমাকে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে না। অধিকন্তু সমরনিপুণা রাণীর মনোহারিণী ভয়ঙ্করী রণ-রঙ্গিণীমূর্ত্তি অবলোকন করিলে প্রাণে যেন কেমন একটা ভাবের উদয় হয়। ভয় ও ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহার রাতুল চরণযুগলে স্বতঃই লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়। চিত্তচকোর সেই মুখচন্দ্রসুধা অবিরত পান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়ে। তাঁহার বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে হস্ত ভয়ে কম্পিত হয়। যে হস্ত নিষ্কোষিত অসি-

ধারণ করিয়া কত শত বীরপুরুষের মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন করিয়াছে, সেই হস্ত কি জানি কি ভয়ে ভীত হইয়া রাণীর বিরুদ্ধে অসি উত্তোলন করিতে সাহসী হয় না। সে দিন নিশীথকালে শিবমন্দিরে রাণীর সেই তীব্রজ্বালাময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া মহাত্রাসে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এমন সাহস হইল না যে, একাকিনী রমণীর সম্মুখীন হই।

এই বীরাঙ্গনা যদি পূর্ব্বাহ্নে কোনওপ্রকারে সংবাদ পাইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে আমার নিস্তারের আর কোন পন্থাই থাকিবে না। সসৈন্যে আমাকে সমরাঙ্গনে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে। আবার তাঁহার মনে উদয় হইল যে, এরূপ রমণীরত্ন যে পুরুষের বক্ষঃদেশে সুশোভিত না হইল, তাহার জীবনই বৃথা। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া এই কামিনী-শিরোমণিকে অঙ্কশায়িনী করিতেই হইবে।

এইরূপ কামনানলে দগ্ধীভূত হইয়া ওস্মান হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন। তিনি পাঠান-বীরগণের মধ্য হইতে প্রায় পঞ্চশত বিখ্যাত রণকুশল যোদ্ধা মনোনীত করিয়া চতুর্ভুজনির্দ্দিষ্ট দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে চতুর্ভুজপ্রেরিত এক বিশ্বাসী গুপ্ত দূত ওস্মানের নিকট উপস্থিত হইল। দূত ওস্মানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"আগামী বৈশাখী অমাবস্যায় রাণী

ছাউনাপুর দুর্গের নিকটবর্ত্তী বাগুড়ী গ্রামে নির্জ্জন ভবানী-দেবীর মন্দিরে তান্ত্রিক সাধনায় পূর্ণাভিষিক্তা হইবেন। সেই দিন রাণীর নিকট তাঁহার গুরুদেব ও দুই চারিজন অনুচরী ও অনুচর ভিন্ন আর কেহই থাকিবে না। সেনাপতি বলিয়া দিয়াছেন যে, অমাবস্যা রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই মন্দিরমধ্যে রাণীকে আক্রমণ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। অতএব আপনি যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে গুপ্তভাবে বাগুড়ি গ্রামে উপস্থিত হইতে পারেন, তজ্জন্য প্রস্তুত হউন।”

ওস্‌মান দূতের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহানন্দে তাহাকে বহুমূল্য পুরস্কার প্রদান করিলেন এবং সেনা-পতিকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া দূতকে বিদায় দিলেন।

অনন্তর ওস্‌মান যথাসময়ে পঞ্চশত সশস্ত্র অশ্বারোহী যোদ্ধার সহিত ভুর্‌স্নুট উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিন দিন অশ্বারোহণে আসিয়া ভুর্‌সুট রাজ্যের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। দিবসের অবশিষ্ট সময় সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া রজনীযোগে ভুর্‌সুটরাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রান্তর ও বনপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি অশ্বা-রোহণে গমন করিয়া প্রভাতের কিছুপূর্ব্বে খানাকুলের নিকটবর্ত্তী এক ঘন অরণ্যে সমস্ত দিন লুক্কায়িত থাকিবার জন্য প্রবেশ করিলেন।

খানাকুলের নিকটবর্ত্তী এক গহন কানন মধ্যে ওস্‌মানের অবস্থান।

মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়াছে। আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক ওস্‌মান সসৈন্যে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছেন। অশ্বসকল বৃক্ষকাণ্ডে আবদ্ধ আছে। এমন সময়ে 'কালু চাঁড়াল' নামক এক ব্যাধ পক্ষী ধরিবার জন্য ঐ বনমধ্যে প্রবেশ করিল। বনমধ্যে গমন করিতে করিতে ব্যাধ অরণ্যমধ্যস্থ সরস মৃত্তিকোপরি বহুসংখ্যক অশ্বের ক্ষুরচিহ্ন, তৃণ-গুল্মাদি পদদলিত ও বহু বৃক্ষশাখা ভগ্ন দেখিতে পাইল। অনন্তর সে অত্যন্ত কৌতূহলপরবশ হইয়া ধীরপদবিক্ষেপে অতি সন্তর্পণে বনপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া বৃক্ষান্তরাল হইতে সে দেখিতে পাইল—অনতিদূরে বহুসংখ্যক অশ্ব বৃক্ষে আবদ্ধ রহিয়াছে এবং বৃক্ষতলে অনেক সশস্ত্র মুসলমান যোদ্ধা বসিয়া ও শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ব্যাধ ইহা দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত ভীত হইল এবং ভাবিতে লাগিল যে, ব্রাহ্মণরাজার রাজ্য মধ্যে এত মুসলমান যোদ্ধা বনমধ্যে লুক্কায়িত কেন? নিশ্চয়ই ইহাদের কোন দুরভিসন্ধি আছে। রাত্রিকালে বোধ হয়, দেশলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইবে।

ব্যাধ, কোতোয়াল ও সেনাপতি চতুর্ভূর্জ।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধ ধীরে ধীরে অরণ্য হইতে বহির্গত হইল এবং থানাকুলের কোতোয়ালের নিকট গমন করিয়া সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল। কোতোয়াল ব্যাধের বাক্যশ্রবণে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ একজন অশ্বারোহীকে পত্রসহ ভবানীপুরে সেনাপতির নিকট প্রেরণ করিল এবং নিজে চৌকিদার, পাইক ও বরকন্দাজ লইয়া অতি সতর্কতার সহিত থানাকুল, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগরগুলি রক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেনাপতি চতুর্ভূর্জ কোতোয়ালের পত্র পাইয়া তাহার উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন,—"একজন নিরক্ষর ব্যাধের কথায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। তোমার যদি কিছু সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি তোমার অধিকারভুক্ত স্থানগুলি রক্ষা কর। আমি সত্বর এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করিতেছি। ইহার জন্য তোমাকে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইতে হইবে না।"

কোতোয়ালকে এই পত্র লিখিয়া চতুর্ভূর্জ ভাবিতে লাগিলেন,—"বোধ হয়, সব ব্যর্থ হয়। এই কথা লইয়া

যদি একটা গোলযোগ হয়, তাহা হইলে আক্রমণের পূর্ব্বেই রাণী সমস্ত ব্যাপার অবগত হইবেন। যাহা হউক, আমাকে সসৈন্যে থানাকুল অভিমুখে গমন করিতে হইল।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেনাপতি চতুর্ভুজ সদলবলে থানাকুল যাত্রা করিলেন। একপ্রহর অতীত হইতে না হইতেই তিনি থানাকুলে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-গণ ও কোতোয়াল আসিয়া চতুর্ভুজের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাঁহারা সেনাপতির নিকট ব্যাধকথিত সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, সেনাপতি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, ভয়ের কোন কারণ নাই। ব্যাধবাক্য সম্পূর্ণ বিশ্বাস-যোগ্য নহে। সে বনমধ্যে কোন দস্যুদল দেখিয়া থাকিবে। যাহা হউক, আমি সসৈন্যে অদ্য রজনীতে এইস্থানে অবস্থান করিতেছি। কল্য প্রভাতে বন অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইবে। নগরবাসী ও নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী ব্যক্তিগণ নির্ভয়ে অবস্থান করুন।

ওস্‌মানের নিকট চতুর্ভুজের চর প্রেরণ।

সেনাপতি সসৈন্যে থানাকুলে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া সকলেরই মন হইতে আতঙ্ক বিদূরিত হইল।

সকলেই নিরুদ্বেগে নিদ্রাসুখে রাত্রিযাপন করিতে লাগিল। কোতোয়াল অনুচরগণের সহিত নগরের প্রান্তভাগ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। চতুর্ভুজ রজনীর অন্ধকারে গুপ্তভাবে অরণ্যমধ্যে ওসমানের নিকট তাহার পূর্ব্বপরিচিত একজন চর প্রেরণ করিলেন। চর ওসমানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল—"সেনাপতি মহাশয় আপনাকে এইদণ্ডেই বাশুড়ী অভিমুখে অগ্রসর হইতে বলিয়া দিয়াছেন। আপনি মাঠে মাঠে গমন করিবেন। আর একপ্রহর অতীত হইলে তিনিও সসৈন্যে আপনার অনুসরণ করিবেন।"

ওস্‌মান বাশুড়ীর পথে।

এতক্ষণ পূর্ব্ব কথামত, ওস্‌মান বনমধ্যে চতুর্ভুজপ্রেরিত চরের জন্য অতি উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সন্ধ্যাকালেই চরের আসিবার কথা ছিল কিন্তু বিলম্ব দেখিয়া ওস্‌মানের মন নানাপ্রকার সন্দেহদোলায় দোলায়মান হইতে লাগিল। তিনি সন্দেহ করিতে লাগিলেন—বুঝি বা চতুর্ভুজ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে সসৈন্যে নিধন করে। রাত্রি এত অধিক হইল, এখনও তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্ব কথামত কোন সংবাদ আসিল না কেন? অতঃপর তিনি অগ্রসর হইবেন কি উড়িষ্যাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন,

এই চিন্তায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে চতুর্ভুজের নিকট হইতে শুভসংবাদ আসিল। চতুর্ভুজের উপর ওসমানের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি চরকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন এবং মহোল্লাসে সসৈন্যে বাগুড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুশিক্ষিত অশ্ব-সকল মাঠের উপর দিয়া নিঃশব্দপদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। যামিনীর শেষযামে তিনি পুড়্শুড়া গ্রামের নিকট দামোদর পার হইলেন।

তখন বৈশাখ মাস, দামোদরের উভয়তীরে বহুদূর পর্য্যন্ত বালুকারাশি ধূধূ করিতেছিল। একটী সংকীর্ণ ক্ষীণ অগভীর জলস্রোত সৈকতভূমির উপর দিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। অতএব দামোদর পার হইতে ওসমান ও তাহার সৈন্যগণের কোন অসুবিধাই হইল না। দামোদর পার হইয়া ওসমান সসৈন্যে বাগুড়ীর দিকে ধাবিত হইলেন।

রাণীর তান্ত্রিক অভিষেক।

আজ অমাবস্যা! ঘোরা কালনিশিথিনী নিবিড় অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। রজনীর প্রথম প্রহর অতীতপ্রায়। বাগুড়ী গ্রাম সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, যেন জনমানব-শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। সকলেই স্ব স্ব গৃহমধ্যে

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কেবল একটী ব্রাহ্মণ-পরিবারের লোকজন গ্রামপ্রান্তস্থিত ভবানীদেবীর মন্দিরে যাতায়াত করিতেছে। এই ব্রাহ্মণবংশে গোলক চট্টোপাধ্যায় নামক একজন ব্রাহ্মণ অতি উন্নত শক্তিসাধক ছিলেন। তিনি রাণীর অভিষেককার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারই লোকজন মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেছিল। মন্দিরের নিকটেই মহাশ্মশান এবং দিগন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তর। মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে রাণীর সমরকুশলা অনুচরিগণ উলঙ্গ কৃপাণহস্তে কালভৈরবীর ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। আর শঙ্করীর অংশভূতা রাণী ভবশঙ্করী ভবানীদেবীর সম্মুখে ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবিষ্ট হইয়া কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি প্রবুদ্ধ করিতে তৎপরা। দক্ষিণপার্শ্বে সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার হরিদেব ভট্টাচার্য্য মহাশক্তির উদ্বোধনে রাণীকে সাহায্য করিতেছেন। এইরূপে অভিষেককার্য্য সম্পন্ন হইল। রাণী স্তদগতচিত্তে দেবীচরণে প্রণতা হইলেন। জগজ্জননী মহাশক্তি দেবীমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া সহাস্যবদনে যেন রাণীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বৎসে! তুই আজ কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিস্। তোর ক্ষুদ্রশক্তি আজ মহাশক্তির সহিত মিলিত হইয়াছে। তুই আজ মহাশক্তিরূপিণী। বিশ্বের অশান্তি ও অমঙ্গল নাশ করিবার জন্য আমি যেমন

মধ্যে মধ্যে দৈত্যদলন ছলে রণরঙ্গে নৃত্য করিয়া থাকি, তুইও আমার শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া নরলোকের অমঙ্গল-নাশ ও শান্তিবিধানের জন্য দুষ্ট দমন কর্। সুরাসুর, নর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব সকলেই মহাহবে তোর শক্তির সম্মুখে, মস্তক অবনত করিবে। পূর্ব্বেই আমি তোর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোকে যে অসি দান করিয়াছি, সেই অসিহস্তে রণাঙ্গনে অবতীর্ণা হইলে অনন্তশক্তি তোর শরীরে আবির্ভূত হইবে। ত্রিশূলপাণি, পিণাকধৃক্ স্বয়ং পশুপতি, কিম্বা চক্র-গদাধারী গরুড়ধ্বজ নারায়ণও যদি তোর শত্রু-রূপে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে তাঁহারাও তোর শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেন। তুই জগদ্ধাত্রী-রূপে জগৎ পরিপালন কর্।" স্বপ্নঘোরে রাণী যেন এই দৈববাণী শুনিতেছিলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল। দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবার জন্য তিনি যেরূপভাবে ভূমির উপর শয়ান হইয়াছিলেন তদ্রূপ অবস্থায় প্রায় এক দণ্ড কাল অতীত হইল। গুরুদেব তারস্বরে দেবীর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে রাণীর বাহ্যজ্ঞান আসিল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া আসনে উপবিষ্টা হইলেন্। তাঁহার দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব দিব্যজ্যোতি বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। পদ্মায়ত নয়নযুগল হইতে সুধারসসিক্ত অগ্নিকণা বহির্গত হইতে

লাগিল, তাঁহার সুগম্ভীর সহাস বদনমণ্ডল এক অভাবনীয় স্বর্গীয় শ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

হরিদেব রাণীর এই অপূর্ব্ব দিব্যমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মাগো! আমি আজ ধন্য হইলাম। তোর দেহ-মধ্যে মহাশক্তির ক্রীড়া দেখিয়া চক্ষু সার্থক হইল। আজ মহাশক্তি তোর দেহে আবির্ভূতা হইয়াছেন।"

গুরুতর সংবাদ লইয়া রাজধানী হইতে দূতের আগমন।

রাণী ভক্তিভরে গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কিয়দ্দূরে বেগবান্ অশ্বের দ্রুত-ক্ষুরক্ষেপ-ধ্বনি উত্থিত হইল। অশ্ব নিমেষ মধ্যে মন্দিরসন্নিকটে উপস্থিত হইল। রাণীর অনুচরিগণ নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে অশ্বকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। অশ্বারোহী স্বীয় করস্থিত তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল এবং 'রাণী মাতার জয় হউক' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রাণী ভবশঙ্করী এই শব্দে মন্দির-দ্বারে আসিয়া দেখিলেন এক যোদ্ধবেশধারী যুবক তাঁহার

অনুচরিগণের সহিত মন্দিরাভিমুখে আগমন করিতেছে। যুবক রাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মস্তক অবনত করিল। রাণী প্রিয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক ঘর্ম্মাক্তকলেবর পরিশ্রান্ত যুবককে আসন পরিগ্রহ করিতে বলিয়া ঘোর নিশাকালে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দূত অতি ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিল, "মন্ত্রী মহাশয় আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আপনাকে এই পত্রখানি দিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া দূত পত্রখানি রাণীর পদপ্রান্তে অর্পণ করিল। রাণী পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন।

এই মর্ম্মে পত্রখানি লিখিত হইয়াছিল—"অদ্য মধ্যাহ্ন-কালে কালু চাঁড়াল নামক এক ব্যাধ পক্ষিশিকারের আশায় খানাকুলের নিকটস্থ অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সে বনপ্রবেশপথে বহু-অশ্বক্ষুর-চিহ্ন দেখিয়া কৌতুকাবিষ্ট-চিত্তে প্রচ্ছন্নভাবে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে থাকে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পায় যে বনমধ্যস্থ এক পরিষ্কৃত ভূখণ্ডে বহুসংখ্যক সশস্ত্র মুসলমান যোদ্ধা বিশ্রাম করিতেছে এবং অশ্বগুলি বৃক্ষকাণ্ডে আবদ্ধ আছে। ব্যাধ দূর হইতে ইহা দেখিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইয়া বন হইতে বাহিরে আইসে এবং খানাকুলের কোতোয়ালের নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করে।"

"কোতোয়াল কালবিলম্ব না করিয়া নিকটবর্ত্তী নগর ও গ্রাম সকল রক্ষা করিবার জন্য চৌকীদার ও পাইক নিযুক্ত করে এবং সেনাপতি চতুর্ভুজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে চতুর্ভুজ সসৈন্যে থানাকুল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। রাত্রি প্রায় একপ্রহরের সময় সেনাপতি থানাকুল হইতে আমাকে সংবাদ পাঠায় যে অনুসন্ধানে জানিলাম ব্যাধের বাক্য ভিত্তিশূন্য, ভয়ের কোন কারণ নাই। রাণী মাতাকে এই সামান্য বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত করিবার কোন কারণ নাই। আমি আজ সসৈন্যে থানাকুলে রহিলাম। যদি ব্যাধের বাক্য সত্যই হয়, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস শত্রুসংখ্যা নিশ্চয়ই অল্প হইবে, তাহা না হইলে তাহারা প্রকাশ্যভাবে আগমন করিতে সাহসী না হইয়া বনমধ্যে লুক্কায়িত থাকিবে কেন? এই অল্প সংখ্যক শত্রু রজনীযোগে যদিই বাহির হইয়া রাজ্যের কোন অনিষ্ট করিতে প্রয়াসী হয় তাহা হইলে আমার সৈন্যগণের অসি-প্রহারে নিশ্চয়ই তাহারা শমনসদনে গমন করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব এই সামান্য বিষয় রাণীকে জানাইবার কোন আবশ্যকতা দেখি না। বিশেষতঃ অদ্য নিশাকালে তিনি অভিষিক্তা হইবেন। অদ্য তাঁহাকে অকারণ উৎকণ্ঠিত না করাই যুক্তিসিদ্ধ, যদি জানাইবার 'একান্ত আবশ্যকতা বুঝিতে

পারা যায়, তাহা হইলে কল্যপ্রাতে তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইলেই চলিবে।

সেনাপতির এই পত্রে আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। চতুর্ভুজ রাজধানীর সমস্ত সৈন্য লইয়া খানাকুল গমন করিয়াছে। অদ্য রজনীতে রাজধানীরক্ষার সম্পূর্ণ ভার কোতোয়াল ও প্রজাবৃন্দের উপর। আপনিও মন্দিরে একাকিনী আছেন। আপনি একটু সতর্ক থাকিবেন। কি জানি যদি কাটৃশাঁকূড়ার শিবমন্দিরে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহারই পুনরভিনয় হয়।”

রাণী পত্রার্থ অবগত হইয়া অতিশয় চিন্তান্বিতা হইলেন এবং কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার জন্য গুরুদেবের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরুদেবও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ছাওনাপুর দুর্গ হইতে অবিলম্বে সৈন্য আনাইবার জন্য রাণীকে অনুরোধ করিলেন। রাণী গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া দুর্গাধিপতির নিকট রাজধানী হইতে আগত দূতকেই প্রেরণ করিলেন।

ছাওনাপুর দুর্গে দূত প্রেরণ।

দূত দ্রুতগামী তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া প্রভঞ্জনবেগে ছাওনাপুর অভিমুখে যাত্রা করিল এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া রাণীর মোহরাঙ্কিত লিপি

প্রহরীর হস্তে অর্পণ করিয়া শীঘ্র উহা দুর্গাধিপের নিকট প্রেরণ করিতে বলিল। দুর্গাধ্যক্ষ রাণীর স্বহস্ত-লিখিত পত্র পাঠ করিবামাত্র দূতকে দুর্গাভ্যন্তরে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে নিদ্রিত সৈন্যগণকে জাগরিত করাইয়া অবিলম্বে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইবার আদেশ দিলেন।

দুর্গমধ্যে মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। সৈন্যগণ সুপ্তোত্থিত হইয়া রণবেশে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। যুদ্ধাশ্ব ও রণ-হস্তিগণ সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিল। অশ্বগণের হ্রেষারবে ও বারণের বৃংহিত ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল শব্দায়মান হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে এক শত রণ-হস্তী এবং পঞ্চশত অশ্ব যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল।

ছাওনাপুর দুর্গস্বামী রাণীর সাহায্যার্থ যাত্রা করিলেন।

দুর্গাধিপ দুর্গরক্ষার্থ অল্পসংখ্যক সৈন্য দুর্গমধ্যে রক্ষা করিয়া অধিকাংশ যোদ্ধা নিজের সঙ্গে লইয়া রাণীর রক্ষার্থ ভবানীদেবীর মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এক শত হস্তী-পৃষ্ঠে এক শত রণকুশল বীর বন্দুক, বম প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইল; তৎপরে পঞ্চশত পদাতিক সৈন্য অসি, চর্ম্ম লইয়া বীর-পদ-ভরে মেদিনী

কম্পিত করিতে করিতে কুঞ্জরগণের অনুসরণ করিতে লাগিল। সর্ব্বশেষে পঞ্চশত যোদ্ধা পঞ্চশত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া চলিল। তাহাদের কটিবন্ধে তরবারি, বামস্কন্ধনিম্নে পৃষ্ঠদেশে ঢাল, দক্ষিণ হস্তে ভীষণ বর্শা শোভা পাইতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সৈন্যগণ সুশৃঙ্খলভাবে ভবানীদেবীর মন্দিরসম্মুখে উপস্থিত হইল এবং বীরকণ্ঠে দিগন্ত কম্পিত করিয়া রাণী ভবশঙ্করীর জয় ঘোষণা করিল।

রাণী রণবেশে।

রাণী স্বয়ং রণবেশে সজ্জিতা হইয়া মন্দির-দ্বারে দণ্ডায়মানা হইলেন এবং সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য সুমধুর গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন "হে বীরগণ! অদ্য রজনীতে মন্ত্রীর নিকট হইতে আমি সংবাদ পাইলাম যে থানাকুলের নিকটস্থ নিবিড় অরণ্যে বহুসংখ্যক মুসলমান যোদ্ধা দিবাভাগে লুক্কায়িত ছিল। সন্ধ্যার সময় সেনাপতি চতুর্ভুজ সসৈন্যে থানাকুলে উপস্থিত হইয়াছে। চতুর্ভুজের উপর আমার বিশ্বাস অতি অল্প। আমার মন যেন আমাকে বলিতেছে যে তাহারই ষড়যন্ত্রে অদ্য রজনীতে রাজ্যমধ্যে এক মহা অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস

চতুর্ভুজ আমাকে রাজধানীতে অনুপস্থিত দেখিয়া, শত্রু-গণকে সাহায্য করিবার জন্য সসৈন্যে খানাকুলে উপস্থিত হইয়াছে এবং এই সংবাদ আমাকে না জানাইবার জন্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করিয়াছে। পাপীষ্ঠের মনোভিলাষ যাহাতে পূর্ণ না হয় তোমরা তদ্বিষয়ে মনোযোগী হও।"

রাণীর বাক্যে দুর্গাধিপের ক্রোধ।

রাণীর বাক্য শেষ হইতে না হইতেই দুর্গাধিপ ক্রোধে অধীর হইয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিতে করিতে ভীষণ গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল,—"মা! আজ্ঞা করুন, এই মুহূর্ত্তেই সদলবলে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করি। দেখি, কোন্ শক্তিবলে পাপাত্মা চতুর্ভুজ রাজ্যের অনিষ্টসাধনে কৃতকার্য্য হয়! আমাদের মধ্যে একজনেরও ধমনীতে যতক্ষণ রক্ত প্রবাহিত হইবে, ততক্ষণ শত্রুগণ রাজধানী হস্তগত করিতে সমর্থ হইবে না। আর আপনি অবিলম্বে রাজবলহাটের দুর্গাধিপের নিকট দূত প্রেরণ করুন, তিনিও যেন নস্করডাঙ্গা হইতে সমস্ত সৈন্য লইয়া আমার সহিত রাজধানী রক্ষায় নিযুক্ত হয়েন। আমরা দুইজনে সসৈন্যে মিলিত হইলে, চতুর্ভুজ পাঠানগণের সহিত মিলিত হইয়াও রাজ্যের কোন অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে না। অধিকন্তু

চতুর্ভুজচালিত সৈন্যগণ তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ত্যাগ করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, চতুর্ভুজের উপর কোন সৈন্যই আন্তরিক সন্তুষ্ট নহে।

দুর্গস্বামীর প্রতি রাণীর উপদেশ।

রাণী দুর্গাধিপের বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে রাজভক্ত বীরচূড়ামণি! তোমার বীরত্ব সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমি জানি, তোমার বীর্য্যবহ্নি শত্রুকুলকে ভস্মীভূত করিতে পারে। কিন্তু বীরবর! ইহা স্থির জানিও, আমি সুস্থ শরীরে ও স্বাধীন-ভাবে রাজ্যমধ্যে বর্ত্তমান থাকিতে চতুর্ভুজ পাঠানগণের সাহায্যে কখনও রাজধানী আক্রমণ কিম্বা রাজ্যের অন্য কোন অনিষ্টসাধন করিবে না। আমি যেন দিব্যচক্ষে দর্শন করিতেছি—চতুর্ভুজ আমাকে করায়ত্ত করিবার অভিপ্রায়ে পাঠান-বীরগণকে আহ্বান করিয়াছে। সে জানে, আমি আজ ভবানীদেবীর মন্দিরে একরূপ অসহায় অবস্থায় সাধনায় নিযুক্ত থাকিব। এই অবসরে, পাপিষ্ঠ, লুক্কায়িত পাঠানগণকে, রজনীর অন্ধকারে মন্দিরমধ্যে আমাকে আক্রমণ করিবার উপদেশ দিয়াছে; পাপাত্মা চতু-র্ভুজ পাঠানদিগকে এইরূপে গুপ্তরাক্ষভাবে সাহায্য করিবে

বলিয়া আমার বিশ্বাস। সে সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইবে না। এমন কি, সৈন্যগণকেও তাহার এই দুরভিসন্ধির কথা জানিতে দিবে না, কারণ তাহারা ইহা জানিতে পারিলে কখনও আমার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইবে না। আমি অনুমান করিতেছি—শীঘ্রই পাঠানগণ রজনীর অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া মন্দির আক্রমণ করিবে। আমি ইচ্ছা করি না যে, মন্দিরের প্রাঙ্গনে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যবনপদস্পর্শে পবিত্র স্থান কলুষিত হইতে দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। অতএব হে বীর! মন্দিরের অনতিদূরে উন্মুক্ত প্রান্তরে সৈন্যসজ্জা কর, বিলম্ব করিও না। শত্রুগণ শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইবে।"

এই বলিয়া রাণী হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ ভীষণ শঙ্খ-ধ্বনি করিলেন। বীর হুহুঙ্কারে দিঙ্‌মণ্ডল কম্পিত হইল। অসি-চর্ম্ম ও বর্শাহস্তে রাণী এক প্রকাণ্ড হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার রণবেশ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন জগজ্জননী দুর্গা মহিষাসুর বধ করিবার জন্য সুতীক্ষ্ণ বর্শা হস্তে ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন।

রাণী স্বয়ং সৈন্যচালনা করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ যেন কোন এক দিব্যশক্তির প্রভাবে শক্তিমান্ হইয়া মহোৎসাহে রাণীর আদেশপালনে তৎপর হইল। রাণী নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে এক অপূর্ব্ব অভেদ্য ব্যূহরচনা করিলেন

এবং নিজে সৈন্যশ্রেণীমধ্যে ভ্রমণ করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

ভীষণ যুদ্ধ।

এমন সময়ে অদূরে বহু বেগবান অশ্বের ক্ষুরক্ষেপধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ক্রমশঃই শব্দ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। রাণী গম্ভীরনাদে শঙ্খধ্বনি করিলেন। সৈন্যগণের হুহুঙ্কার শব্দে রণস্থল কম্পিত হইতে লাগিল। সম্মুখে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী দৃষ্ট হইবামাত্র রাণী তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বাগ্রে বন্দুক ছুড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারিশত বন্দুকের বজ্রনির্ঘোষে পাঠানসৈন্যগণ ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইল। অনেক মুসল্‌মান্ বীর হতাহত হইয়া ভূতলশায়ী হইল।

পাঠানদলপতি ওসমান মনে করিলেন—চতুর্ভুজ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। সে আমাকে এইপথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়া নিজে সসৈন্যে অন্যপথে আগমন পূর্ব্বক অতর্কিতভাবে আমার সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়াছে। যাহা হউক, বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ডকে সমুচিত দণ্ডবিধান না করিয়া আমি কিছুতেই নিবৃত্ত হইব না। এ ক্ষেত্রে রাণীকে হস্তগত করিতে পারি, আর না-ই পারি, চতুর্ভুজকে বন্দী করিতেই হইবে।

পাঠানসর্দ্দার মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ভীমবেগে সদলবলে রাণীর সৈন্যগণের উপর পড়িল। ঘোর সমর বাধিয়া উঠিল। রাণীর আজ্ঞাক্রমে মশালধারিগণ মশাল প্রজ্জ্বলিত করিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন রণস্থল দীপ্ত আলোক-রশ্মিতে উদ্ভাসিত হইল। রাণী ভবশঙ্করী বিশাল শূলহস্তে পর্ব্বতাকৃতি মহাগজকে শত্রুসৈন্যমধ্যে চালিত করিলেন। তাঁহার পার্শ্বদেশে ও পশ্চাদ্ভাগে শত শত রণহস্তী বিশাল শুণ্ড আস্ফালন করিতে করিতে বিপক্ষসৈন্য আক্রমণ করিল।

পাঠান সৈন্যগণ বীরবালার অপার সৌন্দর্য্যময়ী রণ-রঙ্গিণীমূর্ত্তি ও তাঁহার দেহরক্ষিণী অসি-চর্ম্মধারিণী রণোন্মত্তা বীরাঙ্গনাগণকে নিরীক্ষণ করিয়া মহাত্রাসে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। রাণী ভীষণ তীক্ষ্ণাগ্র শূলদ্বারা কাহারও বক্ষঃ, কাহারও মস্তক বিদীর্ণ করিতে করিতে, রণাঙ্গনে রণচণ্ডীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। শতাধিক যবনবীর রণ-শয্যায় শায়িত হইল। অনেকে প্রাণভয়ে পলায়নপর হইল। রাণীর পদাতিক সৈন্যগণ অরাতিসেনার পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিল এবং অশ্বারোহিগণ পলায়মান মুসলমান-বীরগণের পশ্চাদ্ধাবিত হইল।

বীরবর ওস্মান পরাজয় নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াও কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত অদ্ভুত বীরত্ব ও রণ-

কৌশল প্রদর্শন করিতে করিতে রাণীর সৈন্যগণকে অবলীলাক্রমে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া মহাক্রোধভরে রাণী ভবশঙ্করী যে স্থলে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

রাণীর দেহরক্ষিণী বীর-রমণিগণ নিষ্কোষিত তরবারি উত্তোলন করিয়া পাঠানবীর ওস্মানের দিকে ধাবিত হইল। বীরাঙ্গনাগণের সহিত ওস্মান ও তাঁহার অনুচরগণের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষেই বহু হতাহত হইল।

ওস্মানের পরাজয় ও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন।

রাণী তাঁহার কয়েকজন অনুচরীকে সমরশায়িনী হইতে দেখিয়া ক্রোধারুণলোচনে ভীষণ শঙ্খনাদ করিতে করিতে অরিকুলের ভীতি উৎপাদন করতঃ শত্রুসৈন্যমধ্যে এক ভয়ঙ্কর বম্ নিক্ষেপ করিলেন। উহা ভূমিতে পতিত হইয়া মহাশব্দে বিদীর্ণ হইল এবং ওস্মানের অশ্ব সাংঘাতিক আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

বীরশ্রেষ্ঠ ওস্মান পদব্রজে নিষ্কোষিত অসিহস্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাঠান-দলপতির অনুচর যোদ্ধাগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাণীর অস্ত্রাঘাত হইতে ওস্মানের দেহ রক্ষা করিতে লাগিল। রাণী সংহারকারী

মহাশূল প্রহারে তাহাদিগকে ধরাশায়ী করিতে লাগিলেন। তখন ওসমান স্বীয় সম্মুখস্থ মৃত যোদ্ধার অশ্বে আরোহণ করিয়া উলঙ্গ কৃপাণ আস্ফালন করিতে করিতে রাণীর পদাতিক সৈন্যগণের দিকে তীব্রবেগে ধাবিত হইলেন এবং সম্মুখবর্ত্তী যোদ্ধাগণকে অসির আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া শত্রুব্যূহ ভেদকরতঃ রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন।

ওসমান কিয়দ্দূর অশ্বারোহণে গমন করিয়া ফকিরের বেশ ধারণ করিলেন এবং ভিক্ষা করিতে করিতে উড়িষ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই যুদ্ধের পর ওসমান একেবারেই শক্তিশূন্য হইয়া পড়েন। কারণ তিনি কেবলমাত্র বিখ্যাত সেনানায়কগণকে সঙ্গে লইয়া রাণীকে হস্তগত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রাণী ভবশঙ্করীর সহিত যুদ্ধে অধিকাংশ যোদ্ধাই সমরশায়ী হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পর ওসমান আর কখনও মোগলগণের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ পুনরুদ্ধার করিতে সচেষ্ট হয়েন নাই।

আক্‌বর রাণীকে 'রায়বাঘিনী' উপাধি প্রদান করেন।

এই যুদ্ধসংবাদ দিল্লীশ্বর আক্‌বরের কর্ণগোচর হইলে, তিনি রাণী ভবশঙ্করীর বীরত্বে অত্যন্ত বিমুগ্ধ হয়েন এবং

রায়বাঘিনীর পড়া।

এই মাঠ দৈর্ঘ্যে প্রায় ২ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ১ মাইল হইবে। এইস্থানে রাণী ভবশঙ্করী (রায়বাঘিনী)

তাঁহার সহিত যুদ্ধে বিখ্যাত পাঠানবীরগণ নিহত হওয়ায় ভারতে পাঠানশক্তির মেরুদণ্ড চিরতরে ভগ্ন হইল দেখিয়া তিনি রাণীর অদ্ভুত যুদ্ধকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

অবশেষে গুণগ্রাহী মহামতি আকবর রাণী ভবশঙ্করীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য বহুমূল্য উপহারসহ অম্বররাজ মানসিংহকে ভুরসুটে প্রেরণ করেন। মানসিংহ ভুরসুটে আগমন করিয়া রায়বংশীয়া রাণী ভবশঙ্করীকে সম্রাটপ্রেরিত বহু মণি-মাণিক্য এবং তাঁহার পরাক্রমের পুরস্কারস্বরূপ "রায়বাঘিনী" এই বীরত্বসূচক উপাধি প্রদান করেন।

অদ্যাবধি দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গের লোকে কোন নারীর নির্ভীকতা ও উগ্রপ্রকৃতি বুঝাইবার জন্য সচরাচর বলিয়া থাকে—"রমণী যেন রায়বাঘিনী।"

যে স্থানে মহাশক্তিশালিনী রাণী ভবশঙ্করী পাঠান-সর্দ্দারকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পাঠানশক্তি চিরতরে বিলুপ্ত করেন, সেই সমরক্ষেত্র এখনও "রায়বাঘিনীর পড়া" নামে বিখ্যাত আছে। "রায়বাঘিনীর পড়া" তারকেশ্বরের প্রায় ৫।৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই মাইল ও প্রস্থে প্রায় এক মাইল। সম্প্রতি ইহার স্থানে স্থানে চাষ-আবাদ হইতেছে। চাষ করিতে করিতে লাঙ্গলের ফালে ভূগর্ভনিহিত নরকপাল ও নরকঙ্কাল এখনও

মধ্যে মধ্যে উত্তোলিত হয়। এই যুদ্ধক্ষেত্র শীঘ্রই শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-বীরাঙ্গনার বীরত্বের লীলা-ভূমি পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া চিরতরে বিস্মৃতির অতলতলে তলাইয়া যাইবে।

প্রাচীন স্মৃতিরক্ষা।

ভারতের প্রত্যেক জনপদ, প্রত্যেক নগর ও প্রত্যেক গ্রাম মহাপুরুষগণের ও মহামহিমময়ী রমণিগণের পদরেণু-স্পর্শে পবিত্রীকৃত। এই ভারতে কত শত স্বাধ্বীসতী মৃতপতির চিতানলে নিজ দেহ হাসিতে হাসিতে ভস্মীভূত করিয়াছেন। এই ভারতে কতশত শৌর্য্যবীর্য্যবতী রমণী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উলঙ্গ-কৃপাণকরে অরাতি নিধন করিয়াছেন! এই ভারতে কতশত অদ্বিতীয়া বিদুষী জন্ম-গ্রহণ করিয়া বিদ্যার উজ্জ্বল আলোকে জগদুদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন! এই ভারতে প্রেম ও করুণার উৎসরূপিনী কতশত রমণী দুঃখ-দারিদ্র্যদগ্ধ মানবহৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়াছেন! তাহার কি ইয়ত্তা আছে? তাহা কি গণিয়া শেষ করিতে পারা যায়?

বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের দেশের লোকের মুখে শুনিয়া কিম্বা মুসলমান-যুগের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আর কিছু বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।

বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ যে যে বিষয় লিপিবদ্ধ করেন নাই, সেই সেই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইলেও আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হই। টড্ সাহেব যদি রাজপুতকাহিনী না লিখিতেন, তাহা হইলে কি রাজপুত-নারীগণের আধুনিক অবস্থা দেখিয়া আমরা প্রত্যয় করিতে পারিতাম যে, একসময়ে এই রাজপুতানায় শত শত শৌর্য্যশালিনী রমণী নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে রণরঙ্গিণী-বেশে সমরাঙ্গনে নৃত্য করিয়াছিলেন? তাহা হইলে কি আমরা বিশ্বাস করিতাম যে, শত শত রাজপুতরমণী মুসলমান অত্যাচার হইতে সতীত্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দলে দলে অগ্নিকুণ্ডে ঝম্ফপ্রদান করিয়া মুনিমনমোহকর সুকুমার দেহবল্লী ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন? তাহা হইলে কি আমাদের কখনও প্রত্যয় হইত যে, ভারতের দ্বাদশবর্ষী বালকবীর সৈন্যচালনা করিয়া শত্রু-ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইয়াছিল? কখনই নহে।

এই সকল কথা রাজপুতানার লোকের মুখে শুনিলে কিছুতেই বিশ্বাস হইত না। কিন্তু তাঁহাদের নিকট শুনিয়া টড্ সাহেব যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বেদবাক্যবৎ প্রত্যয় করিতে একটুও ইতস্ততঃ করি না। বিদেশীয় পণ্ডিতগণের বাণী, অধুনা বেদবাণী অপেক্ষাও আমাদের নিকট অধিক আদরণীয়।

দুঃখের বিষয়, কোনও ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বঙ্গ-বীরাঙ্গনা রায়-বাঘিনীর বীরত্ব-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন নাই। এরূপ অবস্থায়, সহস্র প্রমাণ সত্ত্বেও এই বঙ্গ-বীরাঙ্গনার অলৌকিক বীরত্ব-কাহিনী বিশ্বাস করিতে অনেকেই ইতস্ততঃ করিবেন।

তাহা হইলেও অধুনা বঙ্গের অনেক নরনারী আপনাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতেই বঙ্গবাসিগণ যেন ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে আবার কোন এক অজানিত শক্তি-বলে জাগিয়া উঠিতেছে। আবার তাহারা ইউরোপীয় মহাসমরে ভারতেশ্বরকে সাহায্য করিবার জন্য নির্ভয়ে, বীরদর্পে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে।

সদাশয় ইংরাজ-রাজ প্রাচীন স্মৃতি রক্ষার জন্য বিশেষ যত্নবান। অতএব প্রধান প্রধান বঙ্গবাসিগণের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা রাজার সাহায্যেই হউক কিম্বা নিজেদের চেষ্টাতেই হউক এই রায়বাঘিনীর যুদ্ধক্ষেত্রে একটী স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া বঙ্গ-বীরাঙ্গনার অদ্ভুত বীরত্ব-কীর্ত্তি রক্ষা করেন।

প্রাচীন স্মৃতি রক্ষার জন্য রাখালকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টা।

এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত রাখালকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

পথপ্রদর্শন করিয়াছেন। এই মহাত্মা বাগুড়ী-নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ইনি ১২৬৭ বঙ্গীয়াব্দের ৩০ শে আশ্বিন কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা বাল্যাবস্থায় ইহাকে ইংরাজি শিখাইবার জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর মনো-যোগের সহিত ইংরাজি শিক্ষা করিলে, ইঁহার একজন পিতৃবন্ধু ইহাঁকে প্রশংসা করিয়া বলেন যে, "তুমি যেরূপ ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতেছ, ইহাতে তুমি নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে একটী বড় চাকুরী পাইবে।" এই কথা শুনিয়া তেজস্বী বালক বলিল, "মহাশয়! লেখাপড়া শিখিলে কি চাকুরীই করিতে হয়?" বালকের কথার উত্তরে তাহার পিতৃবন্ধু বলিলেন, "ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করা চাকুরী করি-বার জন্য বই আর কি?" পিতৃবন্ধুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বালক ইংরাজি শিক্ষা পরিত্যাগ করিল এবং শিবপুর মাতামহ আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। পরে মাতামহ প্রতাপ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অপুত্রক অবস্থায় ইহলীলা সম্বরণ করিলে ইনি ও ইঁহার সহোদর গোকুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়েন, এবং ব্যবসায়াদি স্বাধীন কার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন। এক্ষণে রাখালবাবু শিবপুরের মধ্যে একজন ধনী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। ইনি

হিন্দুর আচার ব্যবহার পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করেন। রাখাল-বাবুর তিনটী পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম অজিৎনারায়ণ, মধ্যমের নাম অচিন্ত্যনারায়ণ এবং কনিষ্ঠের নাম অনুরূপনারায়ণ। তিনটী পুত্রই অতি ধার্ম্মিক এবং উন্নতচেতা।

রাখালবাবু দেবার্চ্চনা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। একদিন তিনি আরাধনায় গাঢ় মনোনিবেশ করিয়া পূজা-গৃহে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল যেন চণ্ডী বলিতেছেন যে, "রাখাল! বাগুড়ী গ্রামে রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করীর স্থাপিত আমার মূর্ত্তি আছে। মন্দির ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তুই আমার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া রাণীর স্মৃতি রক্ষা কর্।"

তৎপরে রাখালবাবু রায়বাঘিনী-প্রতিষ্ঠিত ভবানীদেবীর মন্দির সংস্কার করিয়া দেন। এই ভবানীদেবীর আরাধনা করিয়া রাখালবাবুর পূর্ব্বপুরুষ গোলক, তেজচন্দ্র এবং দুর্গাচরণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

রাখালবাবু ভুরস্থট বাগুড়ীর নিকটস্থ ব্রাহ্মণ-বংশ-প্রতিষ্ঠিত "সরাই-মনসা-দেবীর" মন্দিরও সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। এবং প্রতি বৎসর দশহরার সময় মহা সমারোহে দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। এই সময়ে দেবালয়ের নিকটস্থ স্থানে মেলা বসিয়া থাকে। সর্প-চিকিৎসকগণ দেবীর সম্মুখে ঝাঁপান করিবার জন্য নানা

বিদেশ হইতে এই সময়ে বাগুড়ীগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়।

এক বৎসর এই সময়ে কলিকাতা হইতে কতকগুলি ভদ্রলোক মেলা দেখিতে বাগুড়ীগ্রামে উপস্থিত হয়েন। তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে সর্প-চিকিৎসকগণ দেবীর পূজারীর নিকট কিছু পারিতোষিক প্রার্থনা করে, তাহাতে তিনি তাহাদিগকে বলেন যে, ঐ রাখালবাবু বসিয়া আছেন উঁহার নিকট যাও ; উনি তোমাদিগকে পুরস্কার দিবেন।

তৎপরে তাহারা রাখালবাবুর কথায় বিশ্বাস করিয়া ঝাঁপান আরম্ভ করিল। ঝাঁপান শেষ হইলে যখন তাহারা দেবীর সম্মুখস্থ সরোবরে স্নানার্থ গমন করিল, তখন জল-মধ্যে মুদ্রাবৎ একটী পদার্থ একজনের পায়ে ঠেকিল। সে উহা তুলিয়া দেখিল, যে বহু প্রাচীন কালের একটী রৌপ্য মুদ্রা তাহার হস্তগত হইয়াছে। জগন্মাতা তাহার পরিশ্রমের পুরস্কার দিয়াছেন দেখিয়া সে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে টাকাটি সকলকে দেখাইল। সম্ভবতঃ মুদ্রাটি কোনও সময়ে কোন প্রকারে ঐ বহু প্রাচীন সরোবরে নিপতিত হইয়াছিল, এক্ষণে দৈবাৎ এই ব্যক্তির হস্তগত হইল। যাহা হউক এই ব্যাপার দর্শন করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ রাখালবাবু প্রেমাশ্রুপাত করিতে করিতে ভক্তিভরে দেবীর সম্মুখে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তাহার পর

হইতে রাখালবাবু বৎসরান্তে একবার দশহরার সময় বাগুড়ীগ্রামে গমন করতঃ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মহা মহোৎসব করিয়া থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে ভবানীদেবী ও মনসাদেবীর মন্দির সংস্কার করিয়া দেন। স্বধর্ম্মপরায়ণ, পুণ্যশ্লোক রাখালবাবু যদি দয়া করিয়া বাগুড়ী গ্রামের নিকটবর্ত্তী রায় বাঘিনীর পড়ায় এই বঙ্গ-বীরাঙ্গনার স্মৃতি-রক্ষার জন্য একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি যে বঙ্গবাসীর চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই রায়বাঘিনীর পড়া বঙ্গের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ইহার প্রত্যেক ধূলিকণা বঙ্গবাসীর অমূল্য রত্ন। হে বঙ্গবাসী নর-নারী! এই পবিত্র তীর্থে গমন করিয়া জীবন সার্থক কর। এই মহাতীর্থের একটী সামান্য বালুকাকণা তোমাদের অশক্ত দেহের প্রত্যেক প্রাণহীন রক্তবিন্দুকে এক অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত করিবে।

রাণী ভবশঙ্করীর পরবর্ত্তী নরপতিগণ।

রাণী ভবশঙ্করীর পুত্র প্রতাপনারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, রাণী রাজ-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং পুনরায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত হইলেন। কথিত

আছে রাণী শেষ বয়সে কাশীবাস করেন এবং কাশীতেই ইহলীলা সম্বরণ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করেন।

রাজা প্রতাপনারায়ণের কথা কবিবর ভারতচন্দ্র তাঁহার কবিতার এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ স্থুরেন্দ্র ধরণী মাঝ
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে শশী ঝাঁপ দেয় দুখে
যার যশে হ'য়ে অভিমানী॥
তার পরিজন নিজ কুলের মুখটি দ্বিজ
ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ।
ভূরশিট রাজ্যবাসী নানা কাব্য অভিলাষী
যে বংশে প্রতাপনারায়ণ॥"

প্রতাপনারায়ণের পর তাঁহার পুত্র নরনারায়ণ রাজ্য-লাভ করেন। ইনি একজন অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। রাজা নরনারায়ণ দেবোদ্দেশে ও ব্রাহ্মণদিগকে বহুভূসম্পত্তি দান করেন। তাঁহার মোহরাঙ্কিত দলিলাদি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি ১০৯২ সাল অর্থাৎ ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, ইনি মুসলমান সরকারে বৎসরে একটী টাকা ও একটী ছাগ রাজস্ব-স্বরূপ দিতেন।

লছ্মীনারায়ণ ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের শেষ ব্রাহ্মণ রাজা।

রাজা নরনারায়ণের মৃত্যুর পর লছমীনারায়ণ গড় ভবানীপুরে রাজা হন। রাজা লছমীনারায়ণ সেই সময়ে বঙ্গদেশে একজন মহাবীর ও ধনুর্দ্ধর বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার উগ্রপ্রকৃতির জন্য দেশের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি বিরূপ হন।

বর্দ্ধমান-রাজ কীর্ত্তিচন্দ্র এই সময়ে মুরসিদকুলি খাঁর অনুগ্রহে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। কীর্ত্তিচন্দ্র বনবিষ্ণুপুরের রাজা বাহ্যমকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। মুসলমান নবাবের বলে বলীয়ান হইয়া বর্দ্ধমানের দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী ভূভাগ স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র বলপূর্ব্বক তাহা অধিকার করিতে উদ্যোগী হইলে, রাজা লছমীনারায়ণ অত্যন্ত পরাক্রমের সহিত তাঁহাকে সেই স্থান হইতে বিতাড়িত করেন। কীর্ত্তিচন্দ্র এইরূপে অপমানিত হইয়া মুসলমান-নবাবের শরণাপন্ন হন এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মোগল সৈন্যের ও তোপের সাহায্যে গড় ভবানীপুর আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হয়েন।

ছাউনাপুর গড়ের এইস্থানে দুর্গস্বামী বর্দ্ধমান-রাজ কীর্ত্তিচন্দ্র ও তাঁহার বিংশ সহস্র সৈন্যের সহিত

রাজা লছমীনারায়ণ এতদূর বীর্য্যবান্ ছিলেন যে, কীর্ত্তিচন্দ্র নবাবের সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াও, গড়ভবানীপুর আক্রমণ করিতে প্রথমতঃ সাহসী হন নাই। রাজা লছমীনারায়ণকে স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে, দেশমধ্যে হঠাৎ এই মিথ্যা জনরব প্রচারিত হয় যে, বর্গীগণ ভুরিশ্রেষ্ঠরাজ্য লুণ্ঠন করিবার জন্য তমলুকের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

মহাবীর লছমীনারায়ণ দেশমধ্যে শত্রুর আগমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অরাতিদমন করিবার জন্য বহু হস্তী, অশ্ব ও রণকুশল সৈন্য লইয়া তমলুকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজধানী রক্ষার ভার দাওয়ান রাধাবল্লভ দত্তের উপর অর্পিত হইল।

নবাবীসৈন্য ও তোপসহ বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের গড়ভবানীপুর অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা।

রাজা লছমীনারায়ণ ভুরিশ্রেষ্ঠরাজ্যের প্রসিদ্ধ বীরগণের সহিত রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া তমলুক গমন করিলে, বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র বহুসহস্র নবাবীসৈন্যের সহিত গড়-

ভবানীপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে 'ছাউনাপুর' দুর্গস্বামী শত্রুসৈন্যকে বাধা দিলেন। ঘোরতর সমর বাধিয়া উঠিল। দুর্গমধ্যে যে অল্পসংখ্যক সৈন্য ছিল, তাহার অধিকাংশ এই যুদ্ধে হতাহত হইলে, দুর্গাধ্যক্ষ রাধা-বল্লভ দত্তের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন কিন্তু রাধাবল্লভ দুর্গাধিপতির কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

দুর্গস্বামী অতুলবিক্রমের সহিত শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলেন বটে কিন্তু শত্রুগণকে বাধা দিতে সমর্থ হইলেন না। মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র বিংশসহস্র সৈন্য ও বহুসংখ্যক তোপের সাহায্যে ছাউনাপুর দুর্গাধিপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া গড়ভবানীপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

শত্রুসৈন্য রাজবলহাটের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজবলহাটের নিকটবর্ত্তী 'নস্করডাঙ্গা' নামক স্থানে রাজার এক সেনানিবাস ছিল। কিন্তু এখানেও অতি অল্প-সংখ্যক সৈন্য ছিল। রাজ্যের অধিকাংশ সৈন্যই রাজা লছমীনারায়ণের সহিত তমলুকযাত্রা করিয়াছিল। সুতরাং তত্রত্য সেনাপতি যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া রাজধানীতে সংবাদ পাঠাইলেন এবং রাধাবল্লভের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

রাধাবল্লভ কীর্ত্তিচন্দ্রের বিজয়িনী সেনার প্রতিকুলতাচরণ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। কীর্ত্তিচন্দ্রের সৈন্যগণ

এইস্থানে কিছুমাত্র বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া মহোৎসাহে গড়ভবানীপুরের দিকে চলিল। অতি অল্লায়াসে গড়ভবানীপুর অবরুদ্ধ হইল। শত্রুগণ নগরের চতুর্দ্দিকে তোপ সজ্জিত করিল।

গড়ভবানীপুর বিধ্বস্ত।

এই মহাবিপদের সময় রাণীও রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি রাজার সহিত তমলুক গমন করিয়াছিলেন। রাজপুত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক। রাজ্যের প্রসিদ্ধ বীরগণও অনুপস্থিত। কাজেই দাওয়ানের কার্য্যের উপরই রাজ্যের ভাগ্য নির্ভর করিতেছিল। সহর কোতোয়াল বামাচরণ পালধি যথাশক্তি সহর রক্ষা করিতে লাগিলেন। বিশ্বাসঘাতক দাওয়ান রাধাবল্লভ সহর কোতোয়ালকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, "এ বিপদে রাজ্যরক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্বয়ং নবাব কীর্ত্তিচন্দ্রের সহায় আমাদের রাজাও রাজ্যের সমস্ত বীরগণের সহিত তমলুক যাত্রা করিয়াছেন। এ অবস্থায় যুদ্ধ করিয়া বৃথা প্রজাক্ষয় করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি না। অতএব বশ্যতা স্বীকার করিয়া কীর্ত্তিচন্দ্রের হস্তে রাজ্য অর্পণ করতঃ প্রজাগণের ধন-সম্পত্তি ও কামিনীগণের সম্মান রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করা

কর্ত্তব্য বোধ করিয়া আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। আপনি সম্ভবতঃ আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন।”

কোতোয়াল বামাচরণ দাওয়ানের প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি রাধাবল্লভের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, “রাজার অনুপস্থিতিকালে রাজ্যরক্ষার ভার আমাদেরই উপর সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত। এরূপ অবস্থায়, দেহে প্রাণ থাকিতে জননী জন্মভূমিকে শত্রুহস্তে অর্পণ করা ঘোর কাপুরুষতার কার্য্য। এই মহাবিপদের সময়, দেশরক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়া যে ব্যক্তি ঔদাসীন্য প্রকাশ করে, তাহার মনুষ্যনাম বৃথা। সে নরাকার পশু। সেই পাপাত্মার পাপস্পর্শে ধরিত্রী কলুষিতা হয়েন। অতএব আপনি ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন। শত্রুসৈন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় আর সময়ক্ষেপ করিবার অবসর নাই।”

কোতোয়ালের তিরস্কারবাক্যে দাওয়ানের চৈতন্যোদয় হইল না। দাওয়ান কোতোয়ালকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন,—“আপনি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তবে আমি আপনাকে পদচ্যুত করিলাম। আপনি জানেন, আমিই এক্ষণে ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ্যের রাজা। রাজশক্তি আমার হস্তে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। অদ্য

হইতে আপনি একজন সামান্য প্রজারূপে গণ্য হইবেন।

মহাবীর স্বাধীনচেতা বামাচরণ দাওয়ানের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধকম্পিতহস্তে অসি নিষ্কোষিত করিয়া জলদ্‌গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"কি পাপাত্মন্! তুমি এই রাজ্যের রাজা! রাজশক্তি তোমার হস্তে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান! তুমি আমায় পদচ্যুত করিয়া সামান্য প্রজারূপে গণ্য করিতেছ! আজ যদি রাণীমাতাও রাজধানীতে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তোমার ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত কাপুরুষের মুণ্ড এই তরবারির আঘাতে এই মুহূর্ত্তেই দেহবিচ্যুত হইত।"

এই কথা বলিতে বলিতে কোতোয়াল অশ্বে আরোহণ করিয়া নিমেষমধ্যে সেইস্থান পরিত্যাগ করিলেন। এবং প্রহরিগণের সাহায্যে বামাচরণ প্রাণপণে রাজধানী রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে দেওয়ান প্রাণবল্লভ বিষম বিপদে পড়িলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, কোতোয়াল তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইবে; কিন্তু কোতোয়ালের সম্পূর্ণ বিপরীতভাব দেখিয়া তিনি তাঁহাকে গুপ্তভাবে নিহত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কারণ, তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন, বামাচরণ জীবিত থাকিতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ [illegible] না।

* [illegible]ভূত করিবার জন্য বামাচরণ প্রথম ও

দ্বিতীয় দিন প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে রাজধানীর অধিকাংশ যুদ্ধক্ষম ব্যক্তি নিহত হইল। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পর বামাচরণও গুপ্তঘাতকহস্তে নিহত হইলেন। ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের সমস্ত আশা-ভরসা শেষ হইল।

ইতিমধ্যে রাজা লছমীনারায়ণ ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইয়া সস্ত্রীক দ্রুতগামী ছিপে আরোহণ করিয়া দামোদরপথে ভবানীপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সৈন্যগণ স্থলপথে রাজধানী অভিমুখে আসিতে লাগিল। রাজা লছমীনারায়ণ গড় অবরোধের দ্বিতীয় দিবস নিশীথকালে প্রচ্ছন্ন-ভাবে গড়মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুনিলেন, কোতোয়াল বামাচরণ দুই দিবস প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া অদ্য সন্ধ্যার পর দাও-য়ান নিযুক্ত গুপ্তঘাতকহস্তে নিহত হইয়াছে। রাজা দাও-য়ানের অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সাক্ষাৎ পাইলেন না। অনন্তর রাজ্যরক্ষার আর কোনও আশা নাই দেখিয়া তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করতঃ আত্মীয়-পরিজনকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় ছিপে গিয়া উঠিলেন। ছিপ দ্রুতবেগে দামোদর বহিয়া চলিল।

ভবানীপুর শত্রুহস্তগত হইল। ভুরিশ্রেষ্ঠরাজ্য ব্রাহ্মণ নরপতিগণের হস্ত হইতে চিরতরে বিচ্যুত হইল। বহু প্রাচীনকাল হইতে যে ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য শিল্প-বাণিজ্য, ধন ও বিদ্যার গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল, কতকগুলি নীচ, স্বার্থপর

কাপুরুষ বঙ্গবাসীর বুদ্ধিদোষে সেই মহাসমৃদ্ধিশালী রাজ্যের অধঃপতন ঘটিল।

উপসংহার।

আমরা অতি দীন, অতি হীন, অতি পরমুখাপেক্ষী বঙ্গবাসী। আমরা আর সে বঙ্গবাসী নহি—যাঁহাদের বীর-দর্পে সিংহল, যাবা ও সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ সকল একসময়ে বঙ্গবাসীর পদাবনত হইয়াছিল, আমরা আর সে বঙ্গবাসী নহি যাঁহাদের বিদ্যা ও সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া জাপান আজ বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতায় এসিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, আমরা আর সে বঙ্গবাসী নহি, যাঁহাদের অর্ণবযান সকল তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে যাত্রা করতঃ উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ-সমুদ্র-বক্ষ আলোড়িত করিয়া অকুতোভয়ে নানা দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিত। আমরা আর সে বঙ্গবাসী নহি—যাঁহাদের অদ্ভুত বীরত্বে মোগল বাদসাহ মহামতি আকবরকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। আমরা আর সে বঙ্গবাসী নহি—যাঁহাদের সাহায্যে লর্ড ক্লাইভ ভারতে ইংরাজাধিকার স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

আমরা এখন পশুর অধম—পরপদলেহী কুক্কুর। আমাদের ধন নাই, শক্তি নাই—আমাদের ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, উদ্দেশ্য নাই—আমাদের আচার নাই, ব্যবহার নাই, চরিত্র নাই—আমরা এখন দীনের দীন, হীনের হীন হইয়া পড়িয়াছি। আমরা এখন এত নির্জীব, এত নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছি যে এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতেও উদরান্নের সংযোগ করিতে না পারিয়া জীবন রক্ষার জন্য ভিক্ষাপাত্র হস্তে রাজদ্বারে ভিখারীর বেশে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

কত দেশ বিদেশ হইতে কত জাতি আসিয়া অনন্ত রত্নপ্রসূ বঙ্গভূমি হইতে ধনাহরণ করিয়া মহাসুখে সম্পদে কালাতিপাত করিতেছে, এমন কি মরুভূমিবাসী মাড়োয়ারীগণও বঙ্গদেশে একবস্ত্রে আগমন করতঃ কোটীপতি হইয়া যাইতেছে, কিন্তু বঙ্গ-সন্তান আমরা, যে দরিদ্র সেই দরিদ্রই রহিয়াছি। আমরা কেবল রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া উচ্চ-চীৎকারে বলিতেছি—আমাদের অভাবমোচন কর, আমাদের ক্ষুধার অন্ন দাও, আমাদিগকে রক্ষা কর।

ইহা ব্যতীত আমাদের আর কোন শক্তি নাই। আমাদের চেষ্টা নাই, উদ্যোগ নাই, আত্মনির্ভরতা নাই। তাই আজ আমরা কাঙালের কাঙাল, পথের ভিখারী।

অনেক সময় আমাদের দুর্দ্দশার জন্য আমরা রাজার

উপর দোষারোপ করি, কিন্তু আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না, আমরা কত অসার, কত অপদার্থ, কত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি।

আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে একত্রে থাকিতে পারি না। আমাদের পিতা-পুত্রের মধ্যে একতা নাই, এমন কি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেও প্রকৃত মিলন নাই বলিলেই হয়। আমরা পরশ্রীকাতর, হিংসাপরায়ণ ও ঘোর স্বার্থপর। আমরা গুণীর গুণ গ্রহণ করিতে পারি না, মানীর মান রক্ষা করি না, ভক্তির পাত্রকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করি না। অতএব আমাদের দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী।

আর সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রার পুণ্য জন্মভূমিতে আজ অনেক পিশাচীর অধম নারীর উৎপত্তি হইয়াছে। আর্শী ও উপন্যাস তাহাদের নিত্য-সহচর হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা বিলাসিনীর সাজে সজ্জিত হইয়া পুরুষের স্কন্ধে উঠিয়া নৃত্য করিতে সর্ব্বদা লালায়িত। শারীরিক পরিশ্রম তাহাদের নিকট মহা অপমানজনক হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা এত অকর্ম্মণ্য মাংসপিণ্ড হইয়া উঠিয়াছে যে নড়িতে চড়িতেও একপ্রকার অসমর্থ। যদি তাহারা কখনও পদব্রজে বাটীর বহির্দ্দেশে গমন করে, তাহাদের অদ্ভুত চলনভঙ্গী দর্শনে হাস্যসম্বরণ করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। অনেক দরিদ্রা নারীর দেহ কার্য্যক্ষম আছে বটে

কিন্তু তাহারাও অবস্থাপন্না রমণিগণের অনুকরণে প্রয়াসী হইয়া সংসারে মহা অনর্থ উৎপন্ন করিয়া থাকে। আর পরপদলেহী বঙ্গবাসী পুরুষগণ সমস্ত দিন পরের দাসত্ব করিয়া এই অপদার্থ বিলাসিনী রমণিগণের অভাব দূরীকরণে প্রাণপণে চেষ্টা করে।

যে দেশের রমণিগণ মহা শক্তিরূপে হিন্দুর গৃহে গৃহে বিরাজ করিত, যে দেশের রমণিগণ অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিতে গৃহস্থের গৃহতল উজ্জ্বল করিত, যে দেশের রমণিগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সংসারের সমস্ত লোকজন, অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতির সেব-শুশ্রূষায় প্রাণপাত করিত, যে দেশের রমণিগণ সতীত্ব-গৌরবে পৃথিবীর কামিনিকুলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, যে দেশের রমণিগণ স্বদেশ শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজের স্বামী পুত্রকে নিজের হাতে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিত, যে দেশের রমণিগণ মহাবিপদকালে ধনুর ছিলা করিবার জন্য শিরশোভা কেশপাশ ছেদন করিয়া দিত, এমন কি আবশ্যক হইলে যাহারা নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেও পরাঙ্মুখ হইত না—সেই দেশের সেই পুণ্যক্ষেত্রের রমণিগণ আজ এমন হইল কেন? শক্তিরূপিণী নারিগণ আজ শক্তিহীনা হইল কেন? যাহারা পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি

ছিল, তাহারা আজ মলিনতা-পূর্ণ হইল কেন?

হে বঙ্গবাসিনী রমণিগণ! একবার তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিনী, মহাশক্তিশালিনী কামিনিগণের মোহনমূর্ত্তি মনশ্চক্ষে সন্দর্শন কর। একবার তাহাদের গৌরববিমণ্ডিত মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, একবার রন্ধনশালায় যাইয়া তাহাদের অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি দেখিয়া আইস—তোমাদের হৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত হইবে, বিলাস-বিভ্রম ছুটিয়া যাইবে, মহাশক্তিরূপে তোমরাও পুরুষগণের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিতে সমর্থা হইবে। তোমাদের শক্তিধর পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া জগৎ পবিত্র করিবে। তোমরা ধন্যা ও বরেণ্যা হইয়া রমণিকুলের আদর্শস্থানীয়া হইবে। হিন্দু আমরা, আমাদের দেশে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন যে সকল নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে ভগবান্ ও ভগবতীর অবতার বলিয়া পূজা করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতাম না। আমাদের রামকৃষ্ণ, আমাদের বুদ্ধ, চৈতন্য—আমাদের শঙ্কর, বেদব্যাস—আমাদের সীতা, সাবিত্রী—আমাদের রুক্মিনী, দ্রৌপদী—আমাদের রাধা, সুভদ্রা সকলেই এখনও আমাদের আরাধ্য দেবতা হইয়া আছেন। আমাদের উন্নতচেতা পূর্ব্বপুরুষগণ এই সকল অসাধারণ নরনারীর অর্চ্চনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই আমরা ইঁহাদের পূজা করিয়া থাকি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে

আমাদের নিজের চক্ষু নাই, আমাদের হৃদয় নাই, আমাদের বিচারশক্তি নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে কি আধুনিক সময়ে—এই অধঃপতনের যুগে—যে সকল মহামহিমান্বিত পুরুষ ও মহামহিমময়ী রমণী আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা দেখিতে পাইতাম না? তাহাদের অলৌকিক কার্য্যাবলী আমরা চিন্তা করিতাম না? দেবতা-জ্ঞানে আমরা তাঁহাদিগকে পূজা করিতাম না?

আর্য্য বংশধর হইয়া আমরা পশুর অধম হইয়া পড়িয়াছি। নহিলে কি বঙ্গবাসী আজ ভীরু কাপুরুষ বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত হইত?

যে বঙ্গে সিংহলবিজয়ী বীরাগ্রগণ্য বিজয়সিংহ, রাজা গণেশ, মহাবীর রাজীবলোচন, প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রভৃতি বীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে বঙ্গে রমণিকুল-শিরোমণি রাণী ভবশঙ্করী মহাশক্তিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া রণচণ্ডীবেশে রণাঙ্গণে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই বঙ্গসন্তান আমরা ভীরু কাপুরুষ বলিয়া আজ সকলের হেয়!

বঙ্গবাসিগণ! আসুন, আমরা রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করীর প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্রে স্থাপন করিয়া জগৎকে দেখাই যে, যে বঙ্গবাসিগণ পৃথিবীতে দুর্ব্বল ও ভীরু বলিয়া

পরিচিত, তাঁহাদেরই একজন রমণী প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বীরাঙ্গনাকুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্ভুত সমরকৌশল ও অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আসুন,আমরা ঘরে ঘরে এই বঙ্গ-বীরাঙ্গনা রায়বাঘিনীর চিত্রপট রক্ষা করিয়া মহাদেবীজ্ঞানে তাঁহার পূজা করিয়া ধন্য হই।